স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের
বিষবলয়
রূপান্তরঃ রকিব হাসান
সেবা প্রকাশনা
শ্যামল

Visit www.banglapdf.net For
More Exclusive, High Quality,
Water-mark less
E-books.

Please Give Us Some Credit
When You Share Our Books.

And Don't Remove This
Page. Thank You.

-SHAMOL

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

চুয়ান্ন টাকা

প্রজাপতি প্রকাশন
ও

সেবা প্রকাশনীর .
ক'টি কিশোর ক্লাসিক/অনুবাদ

চার্লস নর্ডহফ ও জেমস্ নরম্যান হল/নিয়াজ মোরশেদ		কনাইলাল রায়	
বাউন্টিতে বিদ্রোহ	৩১/-	দশ কুমার চরিত	২৩/-
মেন এগেইনস্ট দ্য সী	২৮/-	ভিক্টর হুগো	
সারভান্তেস/নিয়াজ মোরশেদ		লা মিজারেবল ইফতেখার আমিন .	৩৫/-
ডন কুইক্সোট	৩৯/-	দ্য ম্যান হু লাফস/শেখ আবদুল হাকিম	৫০/-

চার্লস ডিকেন্স/নিয়াজ মোরশেদ

অলিভার টুইস্ট ৩০/-

আ টেল অভ টু সিটিজ ২৭/-

গ্রেট এক্সপেকটেশানস ৪৩/-

মার্ক টোয়েন

গুড্‌নহেড উইলসন/শেখ আবদুল হাকিম ৪৫/-

হাকলবেরি ফিন/রওশন জামিল ৩৬/-

এমিলি ব্রনটি/নিয়াজ মোরশেদ

ওয়াদারিং হাইটস ২৯/-

হ্যারিয়েট বীচার স্টো/অনীশ দাস অপু

আঙ্কল টমস কেবিন ৪৮/-

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

চাইল্ড অভ স্টর্ম/কাজী মায়মুর হোসেন ৪৩/-

মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ ৪৯/-

ক্লিওপেট্রা/সায়েম সোলায়মান ৫০/-

জেস/সায়েম সোলায়মান ৪৭/-

মন্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন ৭০/-

স্যার ওয়াল্টার স্কট/কাজী মায়মুর হোসেন

রব রয় ৩৪/-

রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী আনোয়ার হোসেন

দ্য ব্ল্যাক সোয়ান ৩৬/-

লাভ অ্যাট আর্মস ৩৮/-

রূপসী বন্দিনী ৬৩/-

টমাস হার্ডি/কাজী শাহনূর হোসেন

টেস অভ দ্য ডার্বারভিল ৫৫/-

ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড ৪৫/-

জুড দ্য অবসকিওর ৪৫/-

দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ ৫০/-

এইচ. দ্য ভের স্ট্যাকপোল/মামনুন শফিক

ব্লু লেগুন ২৯/-

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস/নিয়াজ মোরশেদ ৩৫/-

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

কিডন্যাপড/নিয়াজ মোরশেদ ৩০/-

বাস্কারভিলের হাউন্ড/আসাদুজ্জামান ৩০/-

ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট

রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

চিলড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট ৩০/-

রাডইয়ার্ড কিপলিং

রূপান্তর : খসরু চৌধুরী

দ্য জাঙ্গল বুকস ২৯/-

রূপান্তর : এ.টি.এম শামসুদ্দীন

ডেভিড কপারফিল্ড ৩১/-

লর্ড লিটন

রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই ২৯/-

অ্যানি ফ্র্যাঙ্ক

রূপান্তর : সুরাইয়া আখতার জাহান

অ্যানি ফ্র্যাঙ্কের ডায়েরী ৩৪/-

আলেকজান্দার দ্যুমা

রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্ক ২৮/-

কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো ৪১/-

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

অ্যাইভানহো ৪২/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়

বিষবলয়

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল/রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশ:১৯৮২

এক

২৭ আগস্ট, শুক্রবার।

নিউজ ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ মিস্টার ম্যাকারডলের কাছে তিন দিনের ছুটি চাইলাম। ছুটির কথা শুনে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন তিনি। একপাশের লালচে হয়ে আসা চুলের গোছা আঙুলে পেঁচিয়ে আবার খুললেন। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন প্রকাশ করলেন অনিচ্ছাটা, 'কিন্তু এখন তো ছুটি দেয়া যাবে না। একটা জরুরী কাজ সারতে হবে তোমাকে। গল্পের প্লট জোগাড় করে আনতে হবে। আমার জানামতে সেটা তোমার চেয়ে ভাল আর কেউ পারবে না।'

দমে গেলাম। 'গল্প লিখে লিখে তো বিরক্ত হয়ে গেছি। আর কত? একজনকে কথা দিয়ে ফেলেছি, যেতেই হবে। আমাকে ছাড়া যদি আপাতত চলে···'

'চলবে না,' সাফ বলে দিলেন ম্যাকারডল।

খিঁচড়ে গেল মেজাজ। মুখের ভাব নির্বিকার রাখলাম। মনে মনে গাল দিলাম নিজের পেশাকে। কোন্ কুক্ষণে যে খবরের কাগজে ঢুকেছিলাম! যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম, সাংবাদিকের কোন ছুটি নেই, খবর ফসকে যাওয়ার ভয়ে চব্বিশ ঘণ্টা হুঁশিয়ার থাকতে হয়, তাহলে কোন্ পাগলে এ কাজ করত!

মনে মনে নিজের আর ম্যাকারডলের মুণ্ডুপাত করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'গল্প জোগাড়ের জন্যে কোথায় যেতে হবে?'

'রোদারফিল্ড।'

'মানে?'

'মানে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।'

'চ্যালেঞ্জার!' আমি অবাক।

'হ্যাঁ। ডেইলি কুরিয়ারের অ্যালেক সিম্পসন গিয়েছিল তাঁর বাড়িতে। কথা বলতে। প্রফেসর কথা তো বললেনই না, বেচারার কোটের কলার চেপে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন বড় রাস্তায়, ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। তবে আমার ধারণা, তোমাকে কিছু বলবেন না চ্যালেঞ্জার।'

'তা বলবেন না,' হালকা হয়ে গেল মন। প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করার জন্যেই ছুটি চেয়েছিলাম। তিন বছর আগে 'হারানো পৃথিবী' অভিযানের তৃতীয় বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে খবর পাঠিয়েছেন প্রফেসর। শুধু আমাকেই নয়, গত দুবারের মত প্রফেসর সামারলি আর লর্ড জনকেও। তাঁরাও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু ম্যাকারডলের কাছে কথাটা ভাঙলাম না। পেয়ে বসবে তাহলে।

'সে-জন্যেই তোমাকে পাঠাতে চাই প্রফেসরের ওখানে,' হাতে হাত ঘষছেন ম্যাকারডল। চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল দুই চোখ। 'আমি জানি, কেউ যদি চ্যালেঞ্জারের পেটের কথা বের করতে পারে তো সে তুমি।'

'পেটের কথা! আবার কোন কাণ্ড করেছেন প্রফেসর?'

'কেন, আজকের টাইমস দেখোনি? চ্যালেঞ্জারের লেখা অদ্ভুত একটা চিঠি ছাপা হয়েছে।'

'নাহ্। সময় পাইনি,' বিশেষ আগ্রহ বোধ করলাম না। যাচ্ছি তো প্রফেসরের কাছেই। জরুরী কোন ব্যাপার হলে তিনি নিজেই বলবেন।

মেঝেতে পড়ে থাকা কাগজটা নিচু হয়ে তুলে নিলেন ম্যাকারডল। ঠেলে দিলেন আমার দিকে। 'লাল দাগ দিয়ে রেখেছি। পড়ো। দেখো মাথায় কিছু ঢোকে কিনা।'

চ্যালেঞ্জার যে ভাবে লিখেছেন, ঠিক সে-ভাবেই ছেপে দেয়া হয়েছে চিঠিটা:

ডিয়ার স্যার,

আপনার কাগজে সম্প্রতি প্রকাশিত জেমস উইলসন ম্যাকফেলের চিঠিটা পড়ে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। আহা, কি লেখা! গ্রহ এবং স্থির নক্ষত্রের বর্ণালীতে ফ্রনহোফার লাইন কেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, কি ব্যাখ্যাই না দিয়েছেন ভদ্রলোক! অকাট মূর্খ না হলে এ রকম ব্যাখ্যা দেয় কেউ। তাঁর মতে কোন গুরুত্বই নেই বিষয়টার। অথচ একটু যদি বুদ্ধি (আমার ধারণা সেই বুদ্ধিটা তাঁর নেই) খরচ করতেন, আরেকটু তলিয়ে ভাবতে পারতেন, পিলে চমকে যেত। এই ঝাপসা হয়ে যাওয়ার ওপর নির্ভর করছে এখন পুরো পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। সবাই যাতে বুঝতে পারে সেজন্যে যতটা সম্ভব সহজ করে বলছি।

মহাশূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলো, জানে সবাই। আমাদের পৃথিবীও ঘুরছে। সব দিক থেকে ঘিরে আছে একে ইথারের মহাসমুদ্র। ফ্রনহোফার লাইন আবছা হয়ে যাওয়া অথবা সরে যাওয়ার একটাই মানে, কোন ধরনের ব্যাপক মহাজাগতিক পরিবর্তন আসন্ন, এবং তার কারণ হলো এই ইথার-মহাসমুদ্রে মারাত্মক গোলমাল। কোন কারণে এর স্বচ্ছতা নষ্ট হয়েছে, যার জন্যে ঝাপসা দেখাচ্ছে লাইনগুলো। আমার বিশ্বাস, ভয়াবহ কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছে পৃথিবী, যেটা থেকে কোন প্রাণীরই নিস্তার নেই। এর প্রমাণও পেয়ে গেছি আমি ইতিমধ্যে। মগজ থাকলে আমার বন্ধু মিস্টার জেমস উইলসন ম্যাকফারসনেরও নজরে পড়ে যেত গণ্ডগোলগুলো।

আজকেই খবরের কাগজে বেরিয়েছে, সুমাত্রার আদিবাসীদের মাঝে একটা রহস্যময় রোগ অস্বাভাবিক দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। কেন, কি এর কারণ, কেউ কি কিছু ভেবেছেন? আমি ভেবেছি। সেটা আপাতত বলার দরকার মনে করছি না। বললে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না, হাসাহাসি করবে। তার চেয়ে যখন বিপদটা আসে, তখনই জানুক সবাই। অবশ্য বাঁচানোর কোন উপায় যদি আবিষ্কার করতে পারতাম, তাহলে এখনই

বলতাম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুমাত্রার আদিবাসীদের মত কিংবা অন্য কোন রহস্যময় রোগ খুব শীঘ্রি আমাদেরও ধরতে পারে। আদিবাসীরা আগে আক্রান্ত হয়েছে তার কারণ ওরা সরল-সোজা মানুষ। ইউরোপের মানুষের মত জটিল, প্যাঁচাল চরিত্রের নয়। জটিল মানুষদের রোগে কাবু করতেও সময় লাগে বেশি।

একটা কথা নিশ্চিত জেনে রাখুন, বিপদ আসছে। ভয়ানক বিপদ। কল্পনাও করতে পারবেন না, এমনই ভয়ঙ্কর। আমি যে বাজে কথা বলি না, অতীতে এর বহু প্রমাণ পেয়েছেন। সাবধান করছি না। করে লাভ নেই। যে বিপদ আসছে, কোন উপায় নেই সেটা থেকে রেহাই পাওয়ার। বিদায়!

জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার
ব্রায়ার্স,
রোদারফিল্ড।

পড়া শেষ করে মুখ তুললাম।

'কি বুঝলে?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যাকারডল।

'কিছুই না। খুব সহজ ভাষায় স্পষ্ট করেই লিখেছেন প্রফেসর, ভাষা না বোঝার কোন কারণ নেই। কিন্তু কি যে বোঝাতে চেয়েছেন, সেটা তাঁকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া বুঝতে পারব না। তা ছাড়া চিঠির শেষে বিদায় শব্দটাই বা লিখলেন কেন?'

'তোমার ধারণা, কি হতে পারে?'

'মহামারীতে আক্রান্ত হবে পৃথিবী। তাতে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারসহ আমরা সবাই মারা পড়ব। পৃথিবীর কোটি কোটি লোক মারা যাবে। সে-জন্যে আগেভাগেই বিদায় জানিয়ে রেখেছেন।'

'লোকটা আসলেই পাগল,' চিন্তিত ভঙ্গিতে কাঁচের নলে সিগারেটের একমাথা ঢোকালেন ম্যাকারডল। মুখ তুলে তাকিয়ে আচমকা ছুঁড়ে দিলেন প্রশ্নটা, 'ফ্রনহোফার লাইন কি জানো?'

মাথা নাড়লাম, 'না, জানি না। জানার প্রয়োজনও মনে করি না।'

'আমিও করতাম না, যদি চ্যালেঞ্জারের চিঠিটা না পড়তাম। মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করতে লাগল। চ্যালেঞ্জার পাগল হলেও অসম্ভব বুদ্ধিমান। বাজে কথা বলেন না। নিশ্চয় সৌরজগতে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, যেটা পৃথিবীর ক্ষতি করতে পারে। নেহাত কৌতূহলের বশে একজন পরিচিত বিজ্ঞানীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম। ফ্রনহোফার লাইন সম্পর্কে অনেক কথাই বলল সে, কিছুই মাথায় ঢুকল না। এটুকুই কেবল মনে আছে—সূর্যরশ্মির ব্যান্ড স্পেকট্রামে যে সব সঞ্চরমান কালো রেখা দেখা যায়, সেগুলোকে বলে ফ্রনহোফার লাইন। জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী জোসেফ ফন ফ্রনহোফার এই লাইনের আবিষ্কারক, তাঁর নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে এর।'

'তা তো বুঝলাম,' কিছুই না বুঝে বললাম, 'কিন্তু এর সঙ্গে মহামারীর সম্পর্ক

কোথায়?'

হাত ওল্টালেন ম্যাকারডল। 'আমি কি জানি! 'সেটা জানার জন্যেই তোমাকে পাঠাতে চাইছি চ্যালেঞ্জারের কাছে।'

'সুমাত্রার ঘটনাটা কি?' জানতে চাইলাম।

বিরক্ত হলেন ম্যাকারডল। 'নাহ্, কোন খবরই রাখো না দেখছি! অথচ খবরের কাগজে কাজ করো···'

'সারাদিনই তো একটা না একটা কাজ দিয়ে রাখেন,' মুখের ওপর বলে দিলাম। 'সেগুলো সারতেই জান কাবার। অন্য খবর রাখব কখন?'

কাঁচের নলে ঠোঁট লাগিয়ে জোরে সিগারেটে টান দিলেন ম্যাকারডল। নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'সুমাত্রার আদিবাসীদের নাকি এক আজব রোগে ধরেছে। কোন রকম ইঙ্গিত না দিয়ে মাথা ঘুরে হঠাৎ করে পড়ে যায়। কেউ হুঁশ ফিরে পায়, কেউ পায় না। মুহূর্তে শেষ। এর সঙ্গে মহাজাগতিক পরিবর্তনের যে কি সম্পর্ক, সেটা একমাত্র চ্যালেঞ্জারই বলতে পারেন। এ ঘটনার সঙ্গে মিলে যায় এ রকম আরেকটা অদ্ভুত খবর আছে। একটু আগে সিঙ্গাপুর থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, সুন্দা প্রণালীর লাইট হাউসগুলো অচল। কারণ ওগুলোকে চালানোর মত কোন লোক নেই। সুমাত্রার আদিবাসীদের মতই হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। যারা হুঁশ ফিরে পেয়েছে তারাও অসুস্থ। ফলে গতরাতে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ধ্বংস হয়ে গেছে দুটো জাহাজ।'

'এর সঙ্গে ইথারের কি সম্পর্ক?'

'সেটাই জানতে হবে তোমাকে। প্রফেসরের কাছ থেকে গিয়ে জেনে এসো বিপদটা কি। পত্রিকায় ছেপে দেব। আগে থাকতে মানুষকে সাবধান করা গেলে মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হতে পারে।'

'কিন্তু প্রফেসর তো বললেন কোন উপায় নেই বাঁচানোর, থাকলে তিনি এখনই বলতেন।'

'তবু, গিয়ে দেখো না কি বলেন।'

সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এলাম। ডিসপ্যাচ ক্লার্ক একটা টেলিগ্রামের ফর্ম ধরিয়ে দিল আমার হাতে। বাড়ির ঠিকানায় গিয়েছিল। সেখানে আমাকে না পেয়ে অফিসে দিয়ে গেছে পিয়ন। খুলে পড়লাম। মাত্র কয়েকটা শব্দ:

ম্যালোন, ১৭ হিল স্ট্রীট, স্ট্রেটহ্যাম

অক্সিজেন আনবে। চ্যালেঞ্জার।

অক্সিজেন আনব মানে! কোনও ধরনের রসিকতা? তাই বা কেন করবেন? যে ভঙ্গিতে চিঠি লিখেছেন পত্রিকার সম্পাদককে, তাতে বোঝা যাচ্ছে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। রসবোধ তাঁর নেই, তা নয়, বরং অনেকের চেয়ে বেশিই আছে, তবু এ রকম একটা মুহূর্তে অকারণ রসিকতা প্রফেসর চ্যালেঞ্জার অন্তত করবেন না।

অক্সিজেন কেন নিতে বলেছেন বুঝতে পারলাম না। নতুন কোন পরীক্ষা করছেন নাকি? যে জন্যেই হোক, খবর যখন পাঠিয়েছেন, না নিয়ে পারব না। খালি হাতে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর সাহস আমার নেই।

ঘড়ি দেখলাম। ট্রেন ছাড়তে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। টেলিফোন গাইডবুক

থেকে একটা অক্সিজেন কোম্পানির ঠিকানা টুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ট্যাক্সি ডেকে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে যেতে বললাম ড্রাইভারকে।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখি সামনের বাড়িটার গেট দিয়ে বেরোচ্ছে দুজন লোক। একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। সিলিন্ডারটা ওই গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল ওরা। ওরা বেরোনোর একটু পরই গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন যিনি, তাঁকে এখানে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তালপাতার সিপাই, শুকনো-ঢ্যাঙা দেহ। মুখে ছাগল-দাড়ি। প্রফেসর সামারলি। হারানো পৃথিবী অভিযানে ইনিও আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন।

আপনমনে বকবক করতে করতে ঘোড়াগাড়িটার কাছে যাচ্ছেন সামারলি। আমার গায়ের ওপর এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, 'কি হলো? দেখে চলতে পারেন না···আরে, একি, ম্যালোন যে! এখানে কি?'

'আমারও তো একই প্রশ্ন? আপনি এখানে?'

ম্যালোনের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন সামারলি, 'তোমাকেও অক্সিজেন নিতে বলেছে নাকি? টেলিগ্রাম পেয়েছ?'

'পেয়েছি।'

'ইচ্ছে ছিল না, তবুও নিচ্ছি। দেখা যাক কি করে। চ্যালেঞ্জারকে নিয়ে পারা গেল না আর। ওর বোঝা উচিত ছিল, আমি তার চেয়ে কম ব্যস্ত নই। আমাকে অক্সিজেন নিয়ে যেতে বলা···রীতিমত অন্যায়! কি বলো? ও নিজে অক্সিজেন কিনতে এলে কি ইজ্জত যেত?'

'হয়তো খুব বেশি জরুরী কোন কাজে ব্যস্ত তিনি। নিজের লোক মনে করে আমাদের কাঁধেই দায়িত্বটা চাপিয়েছেন।'

'হবে হয়তো। ঠিক আছে, নিয়ে যখন ফেলেছি, ফেলেছি। তবে তোমার আর নেয়ার দরকার নেই। বড়সড় দেখে নিয়েছি একটা। ওতেই চলে যাবে।'

'আমার তা মনে হয় না। তাহলে দুজনের কাছে টেলিগ্রাম পাঠাতেন না। অকারণে কিছু করেন না তিনি। কথামত দুটো না নিয়ে গেলে রেগে যাবেন।'

'হুঁ,' বিরক্তিতে নাক কুঁচকালেন সামারলি। 'আনো তাহলে আরেকটা। আমার গাড়িতেই তোলো।'

সিলিন্ডার নিয়ে এসে দেখি আপন মনে গজগজ করছেন প্রফেসর। আমাকে দেখে রেগে উঠলেন, 'অত দেরি? জলদি চলো! ট্রেন না ফেল করে বসি!'

তাঁর সঙ্গে এগোলাম। গাড়িতে উঠতে যাব, পেছন থেকে ডাক দিল আমার ট্যাক্সিওয়ালা, 'এই যে মিস্টার, চলে তো যাচ্ছেন! ভাড়াটা?'

এহ্‌হে, মনেই ছিল না। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টাকা বের করে দিলাম। অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে আসল ভাড়ার চেয়ে বেশি দিলাম। কিন্তু খুশি হলো না ও। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল। মনে হলো গাল দিচ্ছে আমাকে।

কি বলছে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, ফিরে তাকাতে হলো সামারলির চিৎকারে। যে ছোকরা দুটো সিলিন্ডার বয়ে এনেছে, ওরা ঝগড়া করছে। পারিশ্রমিক যা দেয়া উচিত, তার চেয়ে বেশি দিয়েছেন প্রফেসর, তাতেও মন

ভরছে না ওদের। ঠিক আমার ট্যাক্সিওয়ালার অবস্থা। এক কথা দুকথা থেকে শেষে ভীষণ চটে গেলেন প্রফেসর। ধরে মারেন আরকি দুই ছোকরাকে। ওরাও মারমুখো হয়ে উঠল।

একজন ভদ্রলোককে অপমান করবে দুই কুলি, এটা সহ্য করতে পারল না প্রফেসরের গাড়ির কোচোয়ান। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল সে। চেপে ধরল এক ছোকরার শার্টের কলার। ঘুসি তুলে এগিয়ে এল আরেক কুলি।

তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লাম ওদের মাঝে। আরও খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই বাধা দিলাম। অনেক কষ্টে থামালাম। দুই ছোকরার হাতে আরও কিছু পয়সা গুঁজে দেয়ার পর সরে দাঁড়াল, তবে ফোঁসফোঁসানি থামল না ওদের। রাগ যেন কমতেই চায় না। ঘটনাটা কি? মেজাজ এমন গরম কেন আজ সবার? কথায় কথায় খেপে উঠছে!

প্রফেসর সামারলির গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি ছাড়ল কোচোয়ান। কুলির সঙ্গে গোলমাল করে তার মেজাজও গরম হয়ে গেছে। বকর বকর করছে আর অযথা চাবুক মারছে ঘোড়াগুলোকে। ভয়ঙ্কর গতিতে এলোপাতাড়ি ছুটছে জানোয়ারগুলো। লণ্ডন শহরের রাস্তায় এ ভাবে গাড়ি চালানো আত্মহত্যার সামিল। উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগলে আর রক্ষা নেই। অনেক বলেও ওর এই বেপরোয়া চালানো থামাতে পারলাম না।

রাস্তার আশেপাশেও শুধু গোলমাল আর গোলমাল। এক জায়গায় মারপিট বাধিয়েছে কয়েকজন। দল বেঁধে দাঁড়িয়ে দেখছে অনেকে, বাধা দেয়ার কেউ নেই। আরেক জায়গায় রাস্তার ওপরই মারামারি করছে কিছু লোক। গাড়ি যাওয়ার পথ রাখেনি। সরতে বললাম। সরল না। আক্রোশটা ঘুরে গেল আমার দিকে। ঘুসি মারার জন্যে গাড়ির পা-দানিতে লাফিয়ে উঠল একজন। ঠেলে ফেলে দিলাম নিচে। অন্যেরা হই-হই করে উঠল। ছুটে এল দল বেঁধে। বেগতিক দেখে লোকজন মাড়িয়েই গাড়ি হাঁকাল কোচোয়ান। দুএকজন চাকার তলায় পড়ে আহত হলো, অন্যেরা লাফিয়ে সরে গেল।

এতসব গণ্ডগোলেই বোধহয় নেতিয়ে পড়েছেন প্রফেসর। বেশি উত্তেজনা সহ্য করতে পারছেন না। আমারই খারাপ লাগছে। আর তাঁর তো বয়েস হয়েছে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সুস্থ দেহেই স্টেশনে পৌঁছলাম। কুলি ডেকে সিলিন্ডার দুটো নামাতে বলে আমি আর প্রফেসর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার গেটের দিকে এগোলাম।

গেটের ভেতরে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘদেহী এক লোক। হলদে সুটে মানিয়েছে বেশ। তীক্ষ্ণ চোখ, ছুরির মত ধারাল নাক। লালচে চুলে রূপালী চিহ্ন, কপালে বয়সের রেখা প্রকট। দুর্দান্ত শিকারী লর্ড জন রক্সটন। হারানো পৃথিবী অভিযানের আরেক অভিযাত্রী।

'আরে প্রফেসর যে!' দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন জন। এগিয়ে এলেন এক পা। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ম্যালোন, কেমন আছ?'

দুটো সিলিন্ডার বয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল কুলিরা।

দেখে হেসে উঠলেন জন। মাথা দুলিয়ে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'তাহলে আপনারাও এনেছেন। আমারটা লাগেজ ভ্যানে তুলে দিয়েছি। ব্যাপারটা কি বলুন তো? অত অক্সিজেন দিয়ে কি করবেন চ্যালেঞ্জার?'

'জানি না,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন সামারলি।

জিজ্ঞেস করলাম, 'টাইমসে প্রফেসরের লেখা একটা চিঠি ছেপেছে। দেখেছেন নাকি?

'কি চিঠি?'

'রাবিশ!' রুক্ষকণ্ঠে বললেন সামারলি, 'স্পাগলামির একটা সীমা থাকা উচিত!'

'আমার মনে হচ্ছে অক্সিজেন জোগাড়ের সঙ্গে ওই চিঠির কোন সম্পর্ক আছে,' বললাম।

'ঘোড়ার ডিম আছে!' প্রায় মারমুখো হয়ে উঠলেন সামারলি। অতিরিক্ত খেপেছেন আজ। বিনা কারণে। 'সব হলো পাগলের পাগলামি!'

ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠে বসলাম। পুরানো প্রিয় ব্রায়ার পাইপে তামাক ভরে আগুন ধরালেন সামারলি। তারপর কষে দিলেন টান। মুখ বন্ধ করে খাড়া উদ্ধত নাকের ফুটো দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন চুপচাপ।

কয়েক মিনিট একটানা ধোঁয়া ছেড়ে দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা সরালেন তিনি। কথা বলে উঠলেন আচমকা। তীব্র ঝাঁঝাল কণ্ঠস্বর, 'লোকটা একটা আস্ত পাগল,' লর্ড জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চ্যালেঞ্জারের কথা বলছি। তবে বুদ্ধি আছে স্বীকার করতেই হবে। মেজাজটা যদি আরেকটু ভাল হতো, পাগলামিটা কমাত, খারাপ লাগত না। মাঝে মাঝে উল্টোপাল্টা কথাও এত বেশি বলে ফেলে···এই যে দেখুন না, পত্রিকায় এক চিঠি ছেপে দিয়েছে, কোনও মানে হয় এর? মহাকাশের ইথারে নাকি গণ্ডগোল। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে পৃথিবীটা ধ্বংস হওয়ার পথে। এগুলো হলো একধরনের স্টান্টবাজি, নিজেকে জাহিরের অপচেষ্টা। বুঝি না মনে করেছেন? খুব বুঝি। ও যদি চলে ডালে ডালে, আমি থাকি পাতায় পাতায়। ওর ভণ্ডামি ধরতে আমার এক মুহূর্ত লাগে না।'

রাগ লাগল আমার। চ্যালেঞ্জারকে পছন্দ করি আমি। তাঁর সম্পর্কে এমন কটূক্তি সহ্য হলো না। আমি কিছু বলার আগেই চাঁছাছোলা জবাব দিলেন লর্ড জন, 'কার সমুন্ধে কি বলছেন, প্রফেসর? এর আগেও চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে টক্কর দেয়ার চেষ্টা করেছেন আপনি। সুবিধে করতে পারেননি। আপনাকে কাত করতে দশটা সেকেন্ডও লাগেনি চ্যালেঞ্জারের। বিজ্ঞানী হিসেবে ওই লোক আপনার ধরাছোঁয়ার বাইরে। কেন ঘাঁটাচ্ছেন? অহেতুক সমালোচনা না করে চুপচাপ থাকুন না বরং। কিংবা অন্য কথা বলুন।'

ঠোঁট শক্ত হয়ে গেল সামারলির। কাঁপতে লাগল ছাগুলে-দাড়ি। কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন লর্ড জনের দিকে। কথা বললেন না। গুম হয়ে রইলেন।

ভারি পরিবেশ সইতে পারেন না লর্ড জন। হালকা করার জন্যে এক চাপড় মেরে বসলেন প্রফেসরের পিঠে, 'রাগ করলেন? আসলে রাগানোর জন্যে বলিনি। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আপনারও বন্ধু। একসঙ্গে কাজ করতে গেলে কথা কাটাকাটি হয়ই, তাই বলে তো আর শত্রু হয়ে যায় না।'

লর্ড জনের কথাগুলো স্বাভাবিক মনে হলেও পিঠ চাপড়ে দেয়াটা বিসদৃশ ঠেকল আমার চোখে। আন্তরিক হওয়ার জন্যে এ রকম ছেলেমানুষী আচরণ সাধারণত করেন না লর্ড।

কিন্তু নরম হলেন না সামারলি। কিছুতেই যেতে চাইছে না রাগ। কঠিন হয়ে উঠেছে চোখ-মুখ। শক্ত করে কামড়ে ধরেছেন পাইপ। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মত অনবরত ধোঁয়া বেরোচ্ছে নাকের ফুটো দিয়ে। পাইপটা দাঁতে চেপে রেখে শুকনো কণ্ঠে বললেন, 'মিস্টার লর্ড জন রক্সটন, আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আমার শত্রু নয়। কিন্তু তার উদ্ভট সব বৈজ্ঞানিক যুক্তি আমিও বিজ্ঞানী হয়ে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেব, এ কথা দুঃস্বপ্নেও ভাববেন না। তার যেমন মগজ আছে, আমারও আছে। একবার তার কাছে হেরেছি বলে যে বার বার হারব, এমন কোন কথা নেই। ফ্রনহোফার লাইন নিয়ে যে যা বলে সব বিশ্বাস করুনগে আপনারা, সেটা আপনাদের ব্যাপার: কিন্তু বয়েস যার আপনাদের চেয়ে বেশি, জ্ঞান-বুদ্ধিতেও বড়, তাকে অন্তত বিশ্বাস করতে বলবেন না। চ্যালেঞ্জারের কথা আমি বিশ্বাস করি না। ইথারে গোলমাল মানেটা কি? অক্সিজেন কমে যাওয়া, বিষাক্ত হয়ে যাওয়া কিংবা ওরকমই কোন ব্যাপার। তাহলে এতক্ষণে সেটা টের পেয়ে যেতাম আমরা। রক্তে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যেত। অস্থির হয়ে উঠতাম আমরা। হয়তো কষ্টও পেতাম। এর কোনটাই ঘটছে না। তাহলে ইথারে গোলমাল হলো কি করে?'

'গোলমাল তো শুরু হয়ে গেছে,' বললাম। 'সুমাত্রায় আদিবাসীরা রহস্যময় রোগে আক্রান্ত। সুন্দা প্রণালীর লাইটহাউসের কর্মচারীরাও ভুগতে আরম্ভ করেছে...'

দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা হাতে নিয়ে নিলেন সামারলি। কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, 'কি বলতে চাও?'

'ম্যাকারডল দুটো টেলিগ্রাম পেয়েছেন সিঙ্গাপুর থেকে। তাতে জানা গেছে, সুমাত্রার আদিবাসীদের মাঝে নাকি একটা রহস্যময় রোগ ছড়িয়ে পড়েছে...'

আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না সামারলি, 'তোমার কি ধারণা, বিষাক্ত ইথারের জন্যে হচ্ছে এ সব? আরে বুদ্ধু, সহজ কথাটা মাথায় এল না যে ইথার সব জায়গায়ই এক? বিষাক্ত ইথার পৃথিবীর ওদিকে থাকলে এদিকেও থাকবে? নাকি তোমার মনে হচ্ছে ইংলিশ ইথার আর সুমাত্রার ইথারে পার্থক্য আছে?'

'আপনি বিজ্ঞানী মানুষ, আপনিই সেটা ভাল বুঝবেন।'

নরম হলেন সামারলি, 'বুঝি বলেই তো বলছি, ইথারের বিষে এ রকম হচ্ছে না। যদি হতো, তাহলে সুমাত্রাবাসীদের মত আমরাও এতক্ষণে আক্রান্ত হয়ে পড়তাম। এত শান্তিতে বসে আর কথা বলা লাগত না এখন।'

'সত্যি কি একেক জায়গার ইথার একেক রকম হতে পারে না? প্রকৃতিতে কত বিস্ময়কর ঘটনাই তো ঘটে। যদি এমন হয়...'

'বিজ্ঞানে যদিফদি বলে কোন কথা নেই। এর সব কিছুই অঙ্কের হিসেবের মত, দুইয়ে দুইয়ে শুধু চারই হবে, পাঁচ হবে না। আমি বলছি, লিখে রাখতে পারো, এই একটিবার অন্তত চ্যালেঞ্জারের ধারণা ভুল হতে বাধ্য।'

'বাজি ধরতে চান?' ভুরু নাচালেন লর্ড জন।
'কিসের ওপর?'
'ইথারে বিষ আছে কি নেই?'
'নেই।'
'আপনি ধরতে চান কিনা বলুন?'
'বললাম তো নেই।'
'তাহলে বাজি ধরতে আপত্তি কোথায়?'
'জুয়া খেলাকে আমি ঘৃণা করি।'
'আসলে আপনার আত্মবিশ্বাস নেই। মুখে বলছেন বটে চ্যালেঞ্জারের ধারণা ভুল, কিন্তু মনে মনে ভাবছেন—কি জানি, সত্যি যদি হয়েই যায়? ওই লোকের কোনও অনুমান আজ পর্যন্ত ভুল হয়নি, জানা আছে আপনার।'
'খোঁচা দিয়ে কথা বলাটা আপনার বদস্বভাব!' রেগে গেলেন সামারলি।
'আপনিও কি ট্রেনে ওঠার পর থেকে কোন ভাল কথা বলেছেন, চ্যালেঞ্জারের বদনাম করা ছাড়া? ভাল মানুষেরা কখনও পেছনে অন্যের সমালোচনা করে না। যে চ্যালেঞ্জারের সম্পর্কে এত খারাপ খারাপ কথা বলছেন, তিনিও কারও সমালোচনা করতে হলে মুখের ওপর করে দেন। সুতরাং নিজেই বিবেচনা করে দেখুন আপনাদের দুজনের মধ্যে কে খারাপ।'
খোঁচাটা হজম করতে কষ্ট হলো সামারলির। 'আমি ভাল কি মন্দ, সেটা আপনার মত নাম সর্বস্ব লর্ডের মুখ থেকে শুনতে চাই না!'
'প্রফেসর সামারলি!' তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন লর্ড জন। রাগে শক্ত হয়ে গেছে শরীর। 'আপনি বয়স্ক মানুষ। শ্রদ্ধাটা এখনও একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। নইলে···'
'নইলে কি করতেন?'
'এক ঘুসিতে নাক ফাটিয়ে দিতাম!'
স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি। এ কি আচরণ শুরু করেছেন দুজন বিখ্যাত, বিশিষ্ট ভদ্রলোক! এ যে দুঃস্বপ্নেরও অতীত!
রাগে, অপমানে ভাষা হারিয়ে ফেলার কথা সামারলির। আগে হলে হয়তো তাই করতেন। কিন্তু এখন করলেন না। কাকের মত কর্কশ গলায় চেঁচাতে লাগলেন, 'আপনি আমার নাক ফাটাবেন? আপনি? আপনার মত নাক ফাটানেওয়ালা কত লর্ড দেখলাম! চতুষ্পদ কতগুলো জন্তু ওই যে খোঁয়াড়ে থাকে আর ব্যা-ব্যা করে তাদের সঙ্গে আপনাদের মত লর্ডদের কোন তফাৎ আছে নাকি?'
বুঝলাম, আর ঠেকানো গেল না। মারপিট শুরু হয়ে যাবে এবার। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই করলেন না লর্ড জন। সামনে ঝুঁকে ঝগড়া করছিলেন, এবার হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন। যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। নাকি আরও ভয়ঙ্কর কিছুর পূর্বপ্রস্তুতি?
সকাল থেকেই আজ দেখছি অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে। সব অস্বাভাবিক। হারানো পৃথিবী অভিযানের সময় কি ভাল সম্পর্কই না ছিল জন আর সামারলির

মাঝে! অথচ আজ এমন খেপে উঠলেন কেন?

মাথার মধ্যে আমারও যেন কেমন করে উঠল। কেঁদে ফেললাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি। চেষ্টা করেও থামাতে পারছি না। আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন দুই বাকযোদ্ধা।

'কাঁদছ কেন? তোমার আবার কি হলো?' জিজ্ঞেস করলেন লর্ড।

'এমনি কাঁদছি,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম। 'কাঁদতে ইচ্ছে করছে। সেই ছেলেবেলার পর থেকে আর কাঁদিনি তো, তাই মনে হলো একবার কেঁদে দেখাই যাক না কেমন লাগে।'

'শরীরটা তোমার ভাল না, ম্যালোন, বুঝতে পারছি,' সহানুভূতির সুরে বললেন লর্ড। 'এক কাজ করো,' সরে জায়গা করে দিলেন তিনি, 'শুয়ে পড়ো। বিশ্রাম নাও। ঠিক হয়ে যাবে।'

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে সামারলি বললেন, 'হুঁ, বুঝেছি। এ জন্যেই অত দেরি করেছিলে সিলিন্ডার আনতে গিয়ে। তাই তো বলি, একটা সিলিন্ডার আনতে এত দেরি কেন? তা এই সময়ে কি মদ না খেলে চলছিল না?'

মুহূর্তে কান্না থেমে গেল আমার। কঠোর কণ্ঠে বললাম, 'মানে! কি বলতে চান?'

খুকখুক করে হাসলেন সামারলি; হাসলেন না কাশলেন ঠিক বোঝা গেল না, 'ধমক দিয়ে কথা বললেই ভেবেছ ঠাণ্ডা হয়ে যাব? সিলিন্ডার আনতে গিয়ে তুমি মদ খেয়ে আসোনি? নেশাটা এতক্ষণে ধরেছে। সেজন্যে কাঁদছ। এটা স্রেফ মাতলামির লক্ষণ।'

'বাজে কথা বলবেন না। মদ আমি খাইনি। এমনিতেই কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।'

'এমনিতে কারও কাঁদতে ইচ্ছে করে? তাও তোমার মত বয়স্ক মানুষের? একজন ঘোড়েল সাংবাদিকের?'

'করে,' খাঁটি দার্শনিকের ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন লর্ড জন, 'মানুষমাত্রই কাঁদতে ইচ্ছে করে। আপনার করে না?'

'না করে না। তবে আমার এখন জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডাকতে ইচ্ছে করছে। ছোটবেলায় খুব চমৎকার নকল করতে পারতাম। এখনও ভুলিনি। ডেকে দেখাব?'

'লাভটা কি হবে তাতে?'

'ম্যালোনের কান্না থেমে যাবে। হেসে উঠবে ও।'

'এমনিতেই থেমে গেছে ওর কান্না।'

'ওপরে ওপরে থেমেছে, ভেতরে এখনও ষোলোআনা রয়ে গেছে ইচ্ছেটা। একটু সুযোগ দিলেই আবার কাঁদতে শুরু করবে। এমন কিছু করা দরকার, যাতে সারাপথ ওর হাসি বজায় থাকে। মোরগের ডাক দিয়েই শুরু করি, কি বলেন?'

'মোরগের ডাক জঘন্য লাগে আমার। হাসি তো আসেই না, ভোরবেলা ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে ঘাড় মটকাতে ইচ্ছে করে।'

'সেটা আপনার করে, ম্যালোনের তো আর করে না। কাঁদার ইচ্ছেটাও

হয়েছে ওর, আপনার নয়। সুতরাং ওকে হাসাতেই হবে।' আর কোন কথা না বলে মোরগের ডাক ডেকে উঠলেন সামারলি। তারপর একে একে নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের ডাক নকল করে ডেকেই চললেন। ভাবভঙ্গিতে পরিষ্কার বোঝা গেল, মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে। তাঁকে তো চিনি, এমন কাণ্ড জীবনেও করতে দেখিনি। আশ্চর্য!

আমার ভাবনাটাই যেন সংক্রমিত হলো লর্ড জনের মাঝে। খবরের কাগজের মার্জিনে কলম দিয়ে কি যেন লিখলেন। কাত করে দেখালেন আমাকে। লিখেছেন: মাথাটা একেবারেই গেছে! ট্রেন থেকে নেমেই পাগলা গারদে পাঠাতে হবে!

তাঁর সঙ্গে আমিও একমত হলাম।

কিছুক্ষণ পর আমার দিকে সরে বসলেন লর্ড। শুরু করলেন বকর বকর। এটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। জোর করেই আমাকে প্রেমের গল্প শোনাবেন। নায়িকা এক নিগ্রো মেয়ে আর নায়ক ভারতীয় রাজা। প্রচুর ঘটনা। কোনটারই কোন মাথামুণ্ড নেই। গল্পের ক্লাইম্যাক্স কখন এল লর্ড জন না বলে দিলে বুঝতাম না।

ওদিকে ডেকেই চলেছেন সামারলি। ক্যানারির ডাক নকল করছেন প্রফেসর। কানমাথা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল আমার। মনে হলো, ওঁরা দুজন ঠিকই আছেন, পাগল হয়ে গেছি আসলে আমি। অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে বাইরে লাফিয়ে পড়ব কিনা ভাবতে লাগলাম। এই সময় জার্ভিস ব্রুক স্টেশনে ঢুকল ট্রেন। প্রাণে বাঁচলাম আপাতত।

আমাদের অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। পরনে জমকাল পোশাক। দম্ভ ও অহঙ্কার ফুটে বেরোচ্ছে সমস্ত অবয়ব থেকে। তাকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হয় আশপাশের মানুষগুলোকে যেন কৃপা করছেন। পাপী বান্দাদের দর্শন দিয়ে ধন্য করে দিচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর। কুৎসিত চেহারা আরও কুৎসিত হয়েছে। দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ছাঁট পড়েনি বহুকাল।

আমাদের দেখেও যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এক পা এগোলেন না। আমরাই এগিয়ে গেলাম। কাছে গেলে নিতান্ত অবহেলায় হাত মেলালেন আমাদের সঙ্গে।

লাগেজ ভ্যান থেকে তিনটে সিলিন্ডার নামিয়ে আনল কুলিরা।

আমাদের অনুসরণের ইঙ্গিত করে আগে আগে হাঁটতে শুরু করলেন চ্যালেঞ্জার। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে দেখলাম তাঁর মস্ত গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার অস্টিন। নির্বিকার। কোন পরিবর্তন হয়নি ওর। আগের মতই আছে।

সবাই উঠে বসলাম গাড়িতে। সিলিন্ডারগুলোও তোলা হলো। এঞ্জিন স্টার্ট দিল অস্টিন।

ওর পাশে বসেছি আমি। পেছনের সীটে চ্যালেঞ্জার, সামারলি আর জন। মোষ শিকারের গল্প শুরু করেলেন লর্ড। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ইথার নিয়ে পড়লেন সামারলি। তাঁর খ্যাকখ্যাকে গলা ছাপিয়ে চ্যালেঞ্জারের গুরুগম্ভীর কণ্ঠের প্রতিবাদ

শোনা যাচ্ছে।

পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে উঠে যাচ্ছে গাড়ি। গতি কমিয়ে মাথাটা আমার দিকে সামান্য হেলিয়ে ফিসফিস করে অস্টিন বলল, 'প্রফেসর চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন আমাকে।'

'গাড়ি তো ঠিকই চালাচ্ছ।'

'বেহায়ার মত আছি। আজ সাতচল্লিশ বার বিদেয় করেছেন আমাকে।'

কিছু একটা বলা উচিত। কি বলব? জিজ্ঞেস করলাম, 'কতবারের বার যাবে?'

'যাব না।'

'জোর করে থাকবে?'

'থাকব।'

'অপমান লাগে না?'

'না।'

দিনটাই যেন কেমন আজ। সবার মধ্যেই অস্বাভাবিক আচরণ। সাতচল্লিশবার চলে যেতে বলার পরও অপমান লাগে না অস্টিনের। 'প্রফেসর তোমাকে সারাক্ষণ দূর দূর করবেন, তা-ও তুমি থাকবে?'

'মন থেকে তো আর করেন না। আমি না থাকলে তাঁর গাড়ি চালাবে কে?'

'অন্য ড্রাইভার দেখে নেবেন।'

'একদিনও কেউ টিকবে না। কে সইবে অত খেঁচাখেঁচি আর অপমান? এতদিন তাঁর নুন খেয়েছি, আজ দুঃসময়ে তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার মত বেঈমানী আমি করতে পারব না, যতই বকাঝকা করুন।'

বুঝতে পারলাম না। 'দুঃসময় মানে?'

কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে বলল অস্টিন, 'প্রফেসর এখন একেবারে পাগল হয়ে গেছেন। বদ্ধ উন্মাদ। আজ সকালে কি করেছে জানেন?'

'কি করেছে?'

'বাড়ির কাজের মেয়েটাকে কামড়ে দিয়েছেন।'

'কামড়ে দিয়েছেন!'

'হ্যাঁ, পায়ে।'

'বলো কি!'

'তাহলেই বুঝুন। বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া এ রকম কাণ্ড কেউ করে? অন্য দিন যেমন-তেমন, আজ যেন অতিরিক্ত বেড়েছে পাগলামিটা। সকাল বেলা মারতে গেল এক পড়শীকে। সে-ও কি আর ছাড়ে? বন্দুক নিয়ে তেড়ে এল। সাহেবও গেলেন বন্দুক আনতে। অনেক কষ্টে হাতেপায়ে ধরে ঠাণ্ডা করলাম পড়শীকে। সাহেব বন্দুক নিয়ে এসে দেখেন নেই। ভাবলেন ভয়ে পালিয়েছে। আমিও কিছু বললাম না।'

'ঝগড়াটা বাধল কি নিয়ে?'

'পড়শীকে বোকা বলেছিলেন সাহেব। ও সাহেবকে গুহামানব বলে গাল দিল। আর কি রোখা যায়!'

ভুল বলেনি পড়শী। হাসি পেল আমার। চেপে গেলাম।

মন্থর গতিতে উঠে যাচ্ছে গাড়ি। উপরে একটা বাঁক। বাঁক পেরোতে চোখে পড়ল প্রফেসরের বাড়ির সামনের নোটিশটা:

সাবধান!
সাংবাদিক আর ভিখারিদের এ দিকে আসা বারণ।
আদেশ অমান্যকারীকে ধরে বিনা বিচারে ঠেঙানো হবে।
সর্বনিম্ন শাস্তি কানমলা।
জি· ই· চ্যালেঞ্জার

নোটিশটা দেখিয়ে অস্টিন বলল, 'ওই দেখুন, কাণ্ড! প্রফেসরের লেখা। কোন সুস্থ মানুষ এ ধরনের নোটিশ লিখতে পারে?'

সাদা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল গাড়ি। লাল সুরকি ঢালা পথ চলে গেছে। দুপাশে রডোডেনড্রনের ঝোপ। সামনে লাল ইঁটের বাড়ি। দরজা-জানালার রঙ ধবধবে সাদা। ছবির মত সাজানো। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ছোটখাট মহিলাটি। হাসি হাসি মুখ।

গাড়ি থামতেই কামানের গোলার মত ছিটকে বেরোলেন চ্যালেঞ্জার। ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন স্ত্রীর কাছে। চেঁচিয়ে বললেন, 'নিয়ে এলাম।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' কোমল স্বরে বললেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। 'তা বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করবে না তো?'

'তোমার কি মনে হয়?'

'আজ তোমার যা অবস্থা, কি যে করবে, ঈশ্বরই জানেন!'

হেসে উঠলেন প্রফেসর। মনে হলো একটা গরিলা ডেকে উঠল বিকট শব্দে। হোহ্ হোহ্ করে ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'সকালে ওই বিটলে পড়শীটাকে মারতে গিয়েছি বলে বলছ তো? পেটানোই উচিত ছিল। ভয়ে না পালালে আজ ওকে গুলি করে মারতাম আমি। আর সারার পায়ে কামড়ে দেয়ার ব্যাপারটা ছিল স্রেফ একটা পরীক্ষা। তা তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

'না, করিনি। তবে মেহমানদের যদি এতটুকু অপমান করেছ, তো সত্যি খারাপ হবে বলে দিলাম।'

'না না, তা কি আর করি। তাহলে চিঠি দিয়ে ডেকে আনলাম কেন? ভুলে যদি করেও ফেলতে চাই তুমি আমাকে ঠেকাবে। তুমি থাকতে আমার ভয় কিসের?' রোমশ বাহু দিয়ে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরলেন প্রফেসর। আমার চোখে গরিলা আর এক হরিণীর ছবি ফুটে উঠল। 'সারা ফিরেছে?'

মাথা নাড়লেন গৃহিণী। 'যে কাণ্ড করেছ, তারপরেও ওর ফেরার সাহস হবে?'

বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়িতে হাত বুলিয়ে মুচকি হাসলেন সাহেব। 'আর ফিরেও লাভ নেই। বাঁচার জন্যে তো চাকরি। সেটার হয়তো আর প্রয়োজনই হবে না ওর কোনদিন।'

প্রফেসরের কথাটা রহস্যময় লাগল আমার কাছে।

কোমর থেকে স্বামীর হাতটা সরিয়ে দিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন মিসেস। বললেন, 'আসুন আপনারা, ঘরে আসুন। অনেক দূর থেকে এসেছেন। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে কিছু মুখে দিয়ে নিন।'

দুই

ডাইনিং রুমে খাওয়া শেষ করে দোতলায় যাবার পথে সবে হলঘরে ঢুকেছি, এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন চ্যালেঞ্জার। গমগম করে উঠল তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই বলছি···প্রফেসর চ্যালেঞ্জার···এখন কাঁদেন কেন? যখন বলেছিলাম তখন তো শোনেননি।···অবস্থা খারাপের আর দেখেছেন কি? দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবেন না। বরং ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে বসে বসে তাকে ডাকুন···' খটাস করে ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিলেন তিনি। আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'মেয়র। এতক্ষণে টনক নড়েছে। মরুকগে, ব্যাটা!'

ওপর তলায় পড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন আমাদের। বিরাট ঘর, প্রচুর আলো-বাতাস। প্রথমেই চোখে পড়ে মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড এক টেবিল। তাতে কয়েকটা টেলিগ্রাম পড়ে আছে। খামগুলো খোলা হয়নি।

একটা খাম তুলে নিতে নিতে বললেন চ্যালেঞ্জার, 'নামটা আমার অনেক বড়। ছোট একটা নাম রাখলে ভাল হয়, অনেক খরচ কমে যাবে বেচারাদের। নোয়া রোদারফিল্ড নামটা কেমন?'

'পচা!' জবাব দিয়ে দিলেন সামারলি।

কুঁচকে গেল গরিলার মুখ। পরক্ষণে ব্যঙ্গের হাসি ফুটল মুখে। তাচ্ছিল্য করলেন সামারলিকে। ফড়াৎ করে একটানে ছিঁড়ে ফেললেন খামের মুখটা। বোঝাতে চাইলেন ইচ্ছে করলে তাঁকেও ওরকম ছিঁড়ে ফেলতে পারেন।

এক এক করে খাম ছিঁড়ে টেলিগ্রামগুলো পড়তে লাগলেন চ্যালেঞ্জার। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম জানালার কাছে। আমার দুপাশে এসে দাঁড়ালেন লর্ড জন আর প্রফেসর সামারলি।

পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে উঠে এসেছে মূল রাস্তা। সেটা থেকে শাখা বেরিয়ে এসেছে চ্যালেঞ্জারের বাড়ি পর্যন্ত। দক্ষিণে খোলা মাঠ। ঢেউয়ের মত ওঠানামা করতে করতে মিলিয়ে গেছে দিগন্তে। পাহাড়ের গোড়ায় সবুজ ঘাসে ঢাকা গলফ ফিল্ড। গলফ খেলছে লোকে। ডানে জঙ্গল। গাছপালা তেমন ঘন নয়। ফাঁক দিয়ে লন্ডন-ব্রাইটন রেলপথটা চোখে পড়ে।

চ্যালেঞ্জারের বিস্ময়ধ্বনি শুনে ঘুরে দাঁড়ালাম। সব কটা টেলিগ্রাম পড়া শেষ করেছেন তিনি। চোখে উত্তেজনা।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইলেন সামারলি।

আমাদের তিনজনের মুখের দিকে এক এক করে নজর বোলালেন চ্যালেঞ্জার। জিজ্ঞেস করলেন, 'লন্ডন থেকে আসার পথে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে আপনাদের?'

কি কথা জানতে চাইছেন চ্যালেঞ্জার বুঝতে পারলাম না। লর্ড জনের দিকে তাকালাম। চুপ করে আছেন। অবশেষে সামারলি বললেন, 'ম্যালোন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড করেছে, যা সে সাধারণত করে না—মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গিয়েছিল…'

'মিথ্যে কথা বলছেন কেন? ও মদ খায়নি,' আমার পক্ষ নিয়ে বললেন লর্ড জন। 'আমি ওর একেবারে গা ঘেঁষে বসেছিলাম। মদ খেলে গন্ধ পেতাম। অস্বাভাবিক কাণ্ড যেটা করেছেন, সেটা আপনি। জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডেকে কান ঝালাপালা করেছেন আমাদের। আপনার মাথার সুস্থতা সম্পর্কেই সন্দেহ হয়ে গিয়েছিল আমাদের।'

'আপনি কি কম বকর বকর করেছেন নাকি?' চটে উঠলেন সামারলি। 'কোথাকার কোন এক ভারতীয় রাজা আর নিগ্রো মেয়ের প্রেমের গল্প…সেই সঙ্গে যোগ করলেন মোষ শিকারের কাহিনী, তা-ও আবার এক ল্যাংড়া মোষ…'

'বুনো মোষ জখম হলে সাক্ষাৎ যম হয়ে যায়, জানেন সেটা?'

'না, জানি না। জানার দরকারও মনে করি না। মোষ দিয়ে আমি কি করব?'

'বড় বেশি প্যাঁচাল পাড়েন আপনারা!' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লেন চ্যালেঞ্জার। 'এটা খোশগল্প কিংবা ঝগড়াঝাঁটির সময় নয়। পরিস্থিতি কতটা খারাপ কল্পনাও করতে পারছেন না আপনারা।'

'না পারার কোন কারণ নেই,' সামারলি বললেন। 'পরিস্থিতি খুবই ভাল। আমার মাথা এত ঠাণ্ডা বহুদিন ছিল না। ইথারে বিষক্রিয়ার কথা বলবেন তো? এর একটা বর্ণও বিশ্বাস করি না আমি।'

'তাই নাকি?' লম্বা দাড়িতে দ্রুত আঙুল চালাতে শুরু করলেন চ্যালেঞ্জার। 'মাই ডিয়ার গ্রেট প্রফেসর, জানতে পারি কি, কি কারণে অধমের এত জোরাল বৈজ্ঞানিক মতবাদটাকে এহেন পথের ধূলির মত অবজ্ঞা?'

ছাগুলে দাড়িতে চ্যালেঞ্জারের ভঙ্গিতে ঘন ঘন আঙুল চালালেন সামারলিও। ঠোঁটের কোণ বাঁকিয়ে হাসলেন। 'খুব সোজা যুক্তি। পৃথিবীর চারদিকেই ইথার। একদিকের ইথার বিষাক্ত হয়ে পড়ার মানে অন্যদিকেও একই ব্যাপার ঘটা। এবং তাই যদি হয়ে থাকত, ট্রেনেই টের পেতাম।'

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রোমশ কপালের ঘাম মুছে জিজ্ঞেস করলেন, 'টের কি পাননি? আপনাদের কথাবার্তা শুনেই তো বুঝতে পারছি সারাটা পথ পাগলামি করতে করতে এসেছেন। যার যা স্বভাব নয়, সেসবই করেছেন। এর মানেটা কি?'

'আপনার কি ধারণা?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন সামারলি।

'আমার ধারণা শুনতে চান? তার আগে শুনুন আজ আমি নিজে কি করেছি। আমার হাউস-কীপারের কাজ করে একটি মেয়ে। নাম সারা। পুরো নামটা জানি না। জানার চেষ্টাও করিনি। স্মৃতির ওপর বোঝা যত কম চাপানো যায় ততই ভাল। মেয়েটা রসকষহীন, উদাসীন, শান্ত, নির্লিপ্ত, আবেগশূন্য। আজ সকালে উঠেই তার ওপর একটা পরীক্ষা চালানোর ভীষণ ইচ্ছে হলো। মেয়েটা কতখানি ঠাণ্ডা মেপে দেখার ইচ্ছে। নাস্তা আনতে বললাম ওকে। ও বেরিয়ে যেতেই

টেবিলের তলায় ঢুকে পড়লাম। লুকিয়ে বসে রইলাম। নাস্তার ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল সে। টেবিল ঘেঁষে এসে দাঁড়াতেই দিলাম হাঁটুর নিচে কামড়ে। এতটা সাকসেসফুল হব কল্পনাও করিনি। আমার দিকে হতবুদ্ধির মত কয়েক সেকেণ্ড ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিয়ে দিল দৌড়। টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে আমিও ওর পিছু নিলাম। কেন কামড় দিয়েছি বুঝিয়ে বলার জন্যে। ও ভাবল আরও কামড়াতে যাচ্ছি। এমন জোরে দৌড় দিল, কিছুতেই ধরতে পারলাম না। ডিয়ার প্রফেসর সামারলি, এ রকম একটা উদ্ভট ঘটনা কেন ঘটালাম অনুমান করতে পারেন? আপনার চৌকস মগজের ভেতরটা ঘেঁটে দেখুন তো কিছু ঢোকে কিনা? লর্ড জন, আপনি বুঝতে পারছেন কিছু?'

'পারছি,' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন জন। 'নিজেকে সামলানোর এখনও সময় আছে, প্রফেসর, নইলে বিপদে পড়বেন। পাগলামিটা একটু কমান।'

'সামারলি, আপনার কি মত?'

'মাথাটা পুরোই বিগড়ে গেছে আপনার। ভাল আর হয় কিনা সন্দেহ।'

রাগলেন না চ্যালেঞ্জার। শান্ত ভঙ্গিতে আমার দিকে ফিরলেন। 'বয়স্কদের মতামত শোনা গেল। ম্যালোন, তোমার কি ধারণা?'

সকালের সৃষ্টিছাড়া সমস্ত ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। লর্ড জনের বিসদৃশ গল্প, আমার অকারণ কান্না, প্রফেসর সামারলির দুর্বোধ্য মেজাজ আর আচরণ, লন্ডনের রাস্তায় দাঙ্গা-মারামারি, ড্রাইভারদের এলোপাতাড়ি গাড়ি চালানো, অক্সিজেনের দোকানে কুলিদের সঙ্গে ঝগড়া, সব কথা ছবির মত ভেসে উঠল মনের পর্দায়। এই সব উন্মত্ততার একটাই কারণ মনে হলো আমার। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বিষ! বিষ ঢুকেছে আমাদের সবার রক্তে। আজব বিষ! মগজ গড়বড় করে দিয়েছে!'

'ঠিক বলেছ!' তুড়ি বাজালেন চ্যালেঞ্জার। 'বিষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি আমরা। ইথারের বিষ বলয়ে ঢুকে পড়েছে পৃথিবী। মিনিটে লক্ষ লক্ষ মাইল গতিতে ঢুকে যাচ্ছে আরও গভীরে। সকাল থেকে উলটোপালটা যা কিছু ঘটেছে শুধু এই কারণে। ইথারের বিষেই মাথা বিগড়েছে আমাদের সকলের। সকালে সারার পা কামড়ে দেয়ার পর থেকে অনেক ভেবেছি। ওরকম একটা উদ্ভট ইচ্ছে জাগল কেন মনে? এতদিন তো জাগেনি! শুধু কি তাই? আমার স্ত্রীকে দরজার আড়াল থেকে হুঙ্কার ছেড়ে চমকে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে দেখি এঞ্জিনের ওপর উবু হয়ে কাজ করছে অস্টিন। পেছন থেকে কষে এক লাথি মারার ইচ্ছে হলো ওর পাছায়। চিন্তায় পড়ে গেলাম। এ রকম অস্বাভাবিক ইচ্ছে হওয়ার কারণ কি? নাড়ি দেখলাম। মিনিটে দশ স্পন্দন বেশি। পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্য। ইথারের বিষক্রিয়া, আর কিছু না। অন্য কিছু হতেই পারে না। এই যে এখন ইচ্ছে করছে প্রফেসরের দাড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ঘাড়টা মচকে দিতে, এটাকে কি সুস্থতার লক্ষণ বলবে কেউ?'

লাফ দিয়ে সরে গেলেন সামারলি। তবে তর্ক করলেন না আর। ট্রেনে নিজেদের আচরণের কথাটাও গুরুত্ব দিয়ে ভাবলেন। তাঁরও মনে হতে লাগল, চ্যালেঞ্জারের যুক্তিই ঠিক। কর্কশ কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব মোলায়েম করে জিজ্ঞেস

করলেন, 'এ থেকে বাঁচার উপায় কি? ভেবেছেন কিছু?'

'অনেক ভেবেছি। কোন উপায় নেই। মরতে হবে আমাদের সবাইকেই।' একলাফে টেবিলে উঠে বসলেন চ্যালেঞ্জার। পা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'পৃথিবীর একটা প্রাণীও বাঁচবে না। সব মরবে।'

জানালার দিকে ঘুরে গেল আমার চোখ। বাইরে তাকালাম। গ্রীষ্মে অপরূপ সাজে সেজেছে প্রকৃতি। ঢেউ খেলানো ফসলের মাঠ, চাষীদের খামার বাড়ি, বন-জঙ্গল-আকাশ···সবই পুরানো দৃশ্য। কিন্তু আজ যেন সবকিছু নতুন লাগল চোখে। সাধারণ জিনিসগুলোকেও মনে হতে লাগল অসাধারণ। কতই না সুন্দর!

চ্যালেঞ্জার বলছেন, 'অনেক বয়েস হয়েছে পৃথিবীর। অনেক জঞ্জাল আর আবর্জনা জমেছে। সব সাফ করতে চান বোধহয় সৃষ্টিকর্তা। ইথারের বিষে চুবিয়ে পুরানো সব ধ্বংস করে দিয়ে আবার নতুন করে সৃষ্টি করতে চান।'

ঘরে পিনপতন নীরবতা। চুপচাপ চ্যালেঞ্জারের কথা শুনছি। এ-কি ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা বলছেন তিনি! কারও মুখে টুঁ শব্দ নেই। চমকে দিল পাশের ঘরে রাখা টেলিফোনের কর্কশ আর্তনাদ।

'আসছি!' লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নেমে বেরিয়ে গেলেন চ্যালেঞ্জার।

চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। কারোরই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

ঠিক দুমিনিট পর গম্ভীর মুখে ফিরে এলেন তিনি। 'ব্রাইটনের মেডিক্যাল অফিসার ফোন করেছে। জানাল, সাগর তীরে নিচু অঞ্চলগুলোতে পাগল হয়ে যাচ্ছে মানুষ। মারা যাচ্ছে দলে দলে। রোগটা ধরতে পারছেন না। আমার কাছে জানতে চাইলেন ইথারের বিষের কারণেই এসব ঘটছে কিনা। বলে দিলাম, ঘটছে। নিশ্চয় নিচু অঞ্চলের ভারি বাতাসে ভর করে বিষাক্ত ইথার নেমে গেছে তাড়াতাড়ি। উঁচু অঞ্চলগুলোতে আরেকটু দেরিতে আঘাত হানবে। তবে খুব একটা সময় নেবে না। বড় জোর কয়েক ঘণ্টার এদিক ওদিক।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন সামারলি। পনেরো সেকেণ্ড বাইরের প্রকৃতি দেখলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চ্যালেঞ্জার, পরিস্থিতি খুবই খারাপ বুঝতে পারছি, বাজে তর্ক করার সময় এখন নেই,' গলা কাঁপছে তাঁর। 'ধরে নিচ্ছি আপনার কথাই ঠিক, ইথারে বিষক্রিয়ার কারণেই ঘটছে এসব। বিপদটা কি কোনভাবেই কাটিয়ে ওঠা যায় না?'

'সত্যি কথাটা শুনবেন? আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না। বিষাক্ত ইথারে কতক্ষণ ডুবে থাকবে পৃথিবী, তার ওপর নির্ভর করবে আমাদের বাঁচামরা।'

লর্ড জন বললেন, 'আজ হোক কাল হোক, জন্মেছি যখন একদিন না একদিন মরতে তো হবেই। যা ঘটে ঘটুক। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না।'

চেয়ারের হাতলে কনুইয়ে ভর রেখে বসে আছি আমি। ঠোঁটে সিগারেট পুড়ছে। টান দিতে ভুলে গেছি। কেমন ঘোর লাগা অবস্থা। ক্লান্তিও লাগছে। বিষের জন্যে হতে পারে।

রোমশ কপাল আর ঘন ভুরু কুঁচকে দাড়িতে কয়েকবার হাত চালালেন চ্যালেঞ্জার। কি যেন ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'লণ্ডন ছাড়ার আগে শেষ খবর

কি শুনেছ?'

'গেজেট অফিসে ছিলাম দশটা নাগাদ। সিঙ্গাপুর থেকে রয়টার খবর পাঠিয়েছে, রহস্যজনক একটা রোগ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে সুমাত্রায়। সুন্দায় লাইট হাউসে আলো জ্বলেনি, কারণ, কর্মচারীরা সব বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন চ্যালেঞ্জার। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এ সময় আবার বাজল টেলিফোন। নেমে চলে গেলেন। এক মিনিট পর ফিরে এসে বললেন, 'সাহায্য চাইছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। যেতে অনুরোধ করেছে। মানা করে দিয়েছি। এখন গিয়ে কোন লাভ নেই।...যাকগে, যেটা আলোচনা করছিলাম আমরা—ইথারের বিষক্রিয়ার প্রথম লক্ষণ মানসিক উত্তেজনা। উত্তেজনার পর ক্লান্তি। তারপর সংজ্ঞাহীনতা। এবং সবশেষে মৃত্যু।

'বিষের ক্রিয়া পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে কয়েক ঘণ্টা আগেই, তুঙ্গে উঠবে আরও কয়েক ঘণ্টা পর। কম উন্নত জাতের লোকেরা আক্রান্ত হয়েছে সবার আগে। শোচনীয় খবর এসেছে আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চল থেকে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা সব প্রায় নিশ্চিহ্ন। বোঝা যাচ্ছে, উত্তর গোলার্ধের চেয়ে দক্ষিণের মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। এই দেখুন,' একটা টেলিগ্রাম হাতে তুলে নিলেন চ্যালেঞ্জার। 'এটা এসেছে মার্সেই থেকে। সকাল পৌনে দশটায়...পড়েই শোনাচ্ছি, দেশ জুড়ে উন্মত্ত উত্তেজনা। নিসের আঙুর খেতে চাষীরা ক্ষিপ্ত। টুলোনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আজ সকাল থেকে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে আরম্ভ করেছে ওখানকার মানুষ। তারপর আর উঠছে না। রাস্তাঘাটে মানুষের লাশ। কাজকর্ম বন্ধ, সব জায়গায় হট্টগোল। ঠিক এক ঘণ্টা পর আরেকটা টেলিগ্রাম এসেছে ওখান থেকেই—সারা দেশ ধ্বংসের মুখোমুখি। গির্জাতে তিলধারণের জায়গা নেই।...একই রকমের টেলিগ্রাম এসেছে প্যারিস থেকে। ফ্রান্স প্রায় জনশূন্য। অস্ট্রিয়ার পাভোনিকরা সব শেষ। সমভূমি আর সাগরতীরের অধিবাসীরা দ্রুত আক্রান্ত হচ্ছে। উঁচু অঞ্চলের ওপর তেমন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া এখনও হয়নি। আমরা পাহাড়ে রয়েছি। আঘাত আসবে আমাদের ওপরও জানা কথা, তবে কিছুটা দেরিতে। বড় জোর কয়েক ঘণ্টা সময় পাব আর।'

হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন লর্ড জন। 'এত কিছু জানার পরও এমন নিশ্চিন্তে টেবিলে বসে পা দোলাচ্ছেন! আশ্চর্য লোক আপনি, প্রফেসর! ভয় পাচ্ছেন না?'

'না, বরং হাসি পাচ্ছে আমার,' চ্যালেঞ্জার বললেন। 'বুঝতে পারছি, এটাও অস্বাভাবিক। ইথারের বিষের জন্যেই হচ্ছে এ রকম। ভোঁতা করে দিয়েছে ভয়ের অনুভূতিগুলো।'

'তাহলে আমাদের দিচ্ছে না কেন?'

'একেকজনের স্নায়ুর জোর একেক রকম। বিষের ক্রিয়াও সম্ভবত স্নায়ুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ওসব ভয়ফয় বাদ দিন। ভয় পেয়ে কোন লাভ নেই। তারচেয়ে যেটা

করা দরকার সেটাই করি চলুন। খেয়ে নিই। আমার স্টোরে আঠারশো ছিয়ানব্বই সালের মদ আছে। বোতলটা খোলার এটাই উপযুক্ত সময়।' টেবিল থেকে নামলেন প্রফেসর। হাসি হাসি মুখ। মৃত্যু নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। 'আসুন। দেরি করলে খাওয়ার শেষ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব।'

দেহটা ঝিমঝিম করছে আমার, কিন্তু খেলাম প্রচুর। সামনে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যে মানুষ এভাবে খেতে পারে, নিজেরা না খেলে সেটা বিশ্বাস করতে পারতাম না। ভবিষ্যৎ ভাগ্যের হাতে। কিন্তু বর্তমান তো আমাদের। এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করলাম। খাবার টেবিলে মাতিয়ে রাখলেন চ্যালেঞ্জার। সামারলিকে বার বার খোঁচা দিয়ে কথা বলতে লাগলেন। টিংটিঙে প্রফেসরও কম যান না। সমান তেজে জবাব দিতে লাগলেন।

অবাক লাগল মিসেস চ্যালেঞ্জারের ভাবভঙ্গি দেখে। একেবারে নির্বিকার। স্বামীর চেয়ে যেন তাঁর স্নায়ুর জোর আরও অনেক বেশি।

খাওয়া শেষ হলো। হাতে-পায়ে এক ধরনের বিচিত্র সুড়সুড়ি অনুভব করছি। কাত হয়ে টেবিলে কনুইয়ে ভর দিয়ে বসলেন লর্ড জন। সোজা থাকার শক্তি পাচ্ছেন না যেন। নেতিয়ে পড়লেন সামারলি।

ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে আনছে অদ্ভুত মৃত্যু। অবসাদ বাড়ছে।

টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট এনে রাখল অস্টিন। চলে যাচ্ছিল, ডাকলেন চ্যালেঞ্জার, 'অস্টিন?'

'স্যার,' ঘুরে দাঁড়াল সে।

'তোমার সেবাযত্নের কথা মনে থাকবে।'

অস্টিনের মুখের কুঁচকানো চামড়ায় হালকা হাসির আভাস খেলে গেল। 'ইয়েস, স্যার।'

'পৃথিবীর প্রাণীকুল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, জানো তো?'

'ক'টার সময়, স্যার?'

'ঠিক সময় বলা কঠিন। তবে সাঁঝের মধ্যে।'

'আচ্ছা।'

'তুমি এখন যাচ্ছ কোথায়?'

'গাড়ি ধুতে।'

এই আরেকজনকে দেখলাম, নির্বিকার। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী মরে সাফ হয়ে যাবে, তাতেও তার কোন মাথাব্যথা নেই। কাজটাই আসল কথা। চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘদিন বাস করে তারা বুঝি এমন নির্বিকারই হয়ে যায়।

'আর ধুয়ে কি হবে?' চ্যালেঞ্জার বললেন। 'ওটাতে চড়ার আর প্রয়োজন হবে না কোনদিন।'

'বসে থেকে কি করব? কাজ করিগে। মৃত্যু যখন আসে, আসবে।'

'গাড়িটা ধোয়া শেষ করেই চলে এসো বেগম সাহেবার মেকাপ রুমে। জলদি জলদি। আমরা সবাই থাকব সেখানে। দেরি করলে হয়তো আর আসার সময়ই পাবে না। এতদিন একসঙ্গে একবাড়িতে থেকেছ, মৃত্যুটা একসঙ্গেই হোক। নাকি, আপত্তি আছে?'

'না, স্যার। আপনি যা বলবেন তাই হবে। চলে আসব।' সেলাম দিয়ে বেরিয়ে গেল অস্টিন।

সিগারেট ধরালেন চ্যালেঞ্জার। বাঁ হাত রাখলেন স্ত্রীর হাতে। 'ভয় করছে?'

'না। যন্ত্রণা হবে?'

'না।'

'তাহলে আর ভয় কি?'

'ভয় নেই।'

'বাঁচার কি কোন উপায় নেই?' লর্ড জন করেছেন, প্রফেসর সামারলি করেছেন, একই প্রশ্ন আবার করলাম আমি।

'মরতে ইচ্ছে করছে না, তাই না?' হাসলেন চ্যালেঞ্জার। 'পৃথিবীটা এমনই এক জায়গা, যেখান থেকে যেতে চায় না কেউ। না, ম্যালোন, বাঁচার সত্যি কোন উপায় নেই। থাকলে কি আর ব্যবস্থা না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতাম?' সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'তবে বাড়তি কয়েক ঘণ্টা প্রাণটাকে ধরে রাখার উপায় একটা আছে। তাতে লাভ কিছু হবে না তেমন, শেষ পর্যন্ত বাঁচব না, তবে অন্যদের মৃত্যু দেখে যেতে পারব। কিভাবে মহাবিষের খপ্পরে পড়ে শেষ হয়ে গেল পৃথিবী, জেনে যেতে পারব…'

'অক্সিজেন কি সেজন্যেই আনতে বলেছেন?' জানতে চাইলেন সামারলি।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সরাসরি অক্সিজেন নাকে টেনে নেয়া তো বিপজ্জনক।'

'সরাসরি নেব কে বলল আপনাকে?'

'তাহলে কিভাবে?'

'বন্ধ ঘরে ছেড়ে দেব অক্সিজেন। ঘরের বাতাস বিষাক্ত হওয়ার আগেই তাতে ঢুকে বসে থাকব সবাই। আমার স্ত্রীর মেকাপ রুমটা কাজে লাগিয়েছি। দরজা-জানালার ফাঁকফোকর সব এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছি যাতে বাতাস ঢুকতেও না পারে, বেরোতেও না পারে।'

কুঁচকে গেছে সামারলির কপালের চামড়া। 'কি দিয়ে করেছেন?'

'মোম আর ভার্নিশ পেপার দিয়ে।'

মাথা নাড়তে নাড়তে সামারলি বললেন, 'বাতাস আর ইথার এক জিনিস নয়, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, সেটা আপনার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। ঘরের বাতাস আটকানো গেলেও ইথার আটকাতে পারবেন না…'

'জানি, পারব না। তবে এটাও জানি, বিষাক্ত ইথারেও অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকলে বিষের ক্রিয়া কমে যাবে। তাতে বেঁচে গেলেও যেতে পারি। ইতিমধ্যেই একটা পরীক্ষা আমি করে দেখেছি। বন্ধ ঘরে বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে দিয়ে তার মধ্যে অতিরিক্ত অক্সিজেন মিশিয়ে দিয়েছি। বসে থেকেছি তার মধ্যে। দম নিতে কষ্ট হয়েছে কিছুটা, কিন্তু মরিনি। এমনকি অজ্ঞানও হইনি। এই পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর পরই আপনাদের সিলিন্ডার নিয়ে আসতে টেলিগ্রাম করেছি। আমার স্টকে ছিল দুটো, আপনারা এনেছেন তিনটা। এই পাঁচটা দিয়ে যতক্ষণ টিকতে পারি, টিকব…'

'কতক্ষণ পারব?'

'জানি না। নিতান্ত দরকার না পড়লে ব্যবহার করব না। কয়েক ঘণ্টা টিকতে পারি, কিংবা কয়েক দিন।...যা হয় হবে,' চেয়ারটা পেছনে ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন চ্যালেঞ্জার। 'চলুন, আমাদের জায়গায় গিয়ে ঢুকে পড়ি।'

তিন

মেকাপ রুমটা বেশি বড় না। তবে পাঁচ-ছয়জন মানুষের বসার জায়গা হয়ে যায় অনায়াসে। একদিকের দেয়ালে ছাতের ঠিক নিচে বিশাল এক ভেন্টিলেটার। কাঠের ফ্রেমে কাঁচের পাল্লা লাগিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে ওটা। তাতে দড়ি বাঁধা। ইচ্ছে করলে দড়ি টেনে খোলা এবং বন্ধ করা যায় পাল্লাটা। ঘরের এককোণে মাটির টবে কয়েকটা গাছ।

দুটো অক্সিজেন সিলিন্ডার আগেই এনে রাখা হয়েছে ঘরে। আমাদের তিনটাও ধরাধরি করে এনে তুললাম। সাজিয়ে রাখলাম একদিকের দেয়াল ঘেঁষে।

চ্যালেঞ্জার বললেন, 'বদ্ধ ঘরে থাকলে ইথারের বিষ না ঢুকলেও আরেকটা অসুবিধে আছে। আমাদের নিঃশ্বাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড। হাতে সময় থাকলে সেটা বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারতাম। অক্সিজেনের বাজে খরচ কমে যেত তাহলে। কিন্তু বড়ই তাড়াহুড়া। সেজন্যে ওই গাছগুলো এনে রেখেছি, সামান্য হলেও কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নেবে। এবং সেটুকুই লাভ।'

এই ঘরেও একটা বড় জানালা আছে। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। স্টেশনের দিক থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি আসতে দেখলাম। পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে গাড়ি টেনে নিয়ে ওপরে উঠতে কষ্ট হচ্ছে ঘোড়াগুলোর। মান্ধাতার আমলের ওসব ছ্যাকরা গাড়ি শহর থেকে বিদেয় হয়ে এসে ঠাঁই নিয়েছে গ্রামাঞ্চলে।

পাহাড়ের গোড়ায় পেরামবুলেটরে বসিয়ে বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে একজন আয়া।

কটেজগুলোর চিমনি দিয়ে হালকা কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ধীর গতিতে ভেসে চলে যাচ্ছে মাঠের ওপর দিয়ে। মাঠে ফসল কাটছে চাষীরা। গলফ-ফিল্ডে গলফ খেলোয়াড়েরাও আছে। কই, বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণ তো ওদের মাঝে দেখা যাচ্ছে না?

আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন লর্ড জন। চ্যালেঞ্জার যাতে শুনতে না পান, ফিসফিস করে বললাম, 'দেখুন ওদের। সবাই তো শান্ত। বিষ কোথায়?'

'জানি না। উঁচু অঞ্চল তো, এখনও তাই বিষের ক্রিয়া শুরু হয়নি ভালমত...'

তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লেন চ্যালেঞ্জার, 'দূর, এ সময়ে আবার কে ডাকে!' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ফিরে এসে বললেন, 'মেয়র। জানতে চাইল, বিষের ক্রিয়া শুরু হতে আর কত দেরি।'

'কি জবাব দিলেন?' সামারলির প্রশ্ন।

'বললাম, নিজের যখন দম আটকে আসবে তখনই বুঝবেন বিষক্রিয়া শুরু

হয়ে গেছে। এত্তোবড় হাঁদা এই মানুষগুলো, সহজ জবাবটাও জানে না। ওদিকে মেয়র হয়েছে! গাধা কোথাকার! যতসব অপদার্থের দল পৃথিবী শাসন করছে বলেই মানুষের কোন শান্তি নেই।'

হাতঘড়িতে দেখলাম বেলা তিনটা। হঠাৎ চাষীদের মাঝে চঞ্চলতা দেখা গেল। গলফ খেলোয়াড়েরাও অস্থির। খেলায় মন নেই। এদিক ওদিক ছুটোছুটি শুরু করেছে। কয়েকজন হাতের ব্যাট ফেলে বাড়িমুখো দৌড় দিল।

আবার বেজে উঠল টেলিফোন। বেরিয়ে গেলেন চ্যালেঞ্জার। কয়েক সেকেন্ড পর চিৎকার করে ডাকলেন, 'ম্যালোন, তোমার ফোন।'

দৌড়ে গেলাম। লন্ডন থেকে ম্যাকারডল করেছেন। আমি রিসিভার কানে ঠেকিয়ে সাড়া দিতে ওপাশ থেকে ভেসে এল উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, 'ম্যালোন? কি খবর? এদিকে তো সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু হয়েছে। রাস্তায় দলে দলে পড়ে যাচ্ছে মানুষ। উঠছে না আর। চ্যালেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করো তো ব্যাপার কি?'

'জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, আমিই জানি। ঠিকই বলেছিলেন তিনি, ইথারে গোলমাল। মারাত্মক বিষাক্ত হয়ে গেছে। সেজন্যেই মারা পড়ছে মানুষ। পৃথিবীর সব প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ বাঁচবে না।'

'ঠেকানোর কোন উপায়ই কি নেই?'

'না। মরতে আমাদের হবেই। মাথাটা ভারি লাগছে আমার, মিস্টার ম্যাকারডল। আপনার কেমন লাগছে জানি না। আর কোনদিন দেখা হবে না আমাদের। বিদায়।'

'চ্যালেঞ্জারের ধারণাই তাহলে সত্যি হলো···সময়মতই বিদায় জানিয়েছিলেন···মাথা আমারও ভারি লাগছে···কয় মিনিট আর টিকব কে জানে! বিদায়, ম্যালোন···' খট করে একটা আওয়াজ হলো। চিৎকার করে উঠলাম 'হ্যালো, হ্যালো' বলে। জবাবে কেবল ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ। ম্যাকারডলের দম নিতে কষ্ট হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। রিসিভারটা ধরে রাখতে পারেননি, হাত থেকে খসে টেবিলে পড়াতে খট করে শব্দ হয়েছে।

আরও কয়েকবার হ্যালো হ্যালো করলাম। কোন সাড়া নেই। আস্তে করে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখলাম। বেদনায় ভারি হয়ে গেল মনটা। ওই গলা আর কোনদিন শুনতে পাব না।

মেকাপ রূমে চললাম আবার। আজব এক অনুভূতি হচ্ছে! পানিতে ডুব দিয়ে বেশিক্ষণ দম আটকে রাখলে যেমন হয় অনেকটা সেরকম। গলা টিপে ধরেছে যেন কেউ। বুকে তীব্র চাপ। ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল কান।

আমার পাশ দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে গেলেন চ্যালেঞ্জার। ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছেন। চোখ টকটকে লাল। খাড়া হয়ে উঠেছে চুল। সংজ্ঞাহীন স্ত্রীর ছোট্ট দেহটা কাঁধে ঝুলছে। পাশের একটা ঘর থেকে নিয়ে এসেছেন। মেকাপ রূমে ঢুকে গেলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড পর বেরিয়ে এলেন আবার। চিৎকার করে বললেন, 'জলদি গিয়ে মেকাপ রূমে ঢোকো! আমি অস্টিনকে ডেকে নিয়ে আসি! এত করে বললাম তাড়াতাড়ি আসতে···'

বুঝতে অসুবিধে হলো না ইথার-বিষের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে প্রবলভাবে।

প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দৌড় দিলাম মেকাপ রুমের দিকে। পা টলছে। শেষ পর্যন্ত ঘরে ঢুকতে পারব কিনা জানি না। কোনমতে দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই আমার হাত ধরে একটানে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন লর্ড জন। শুইয়ে দিলেন কার্পেটের ওপর। কয়েক হাত দূরে পড়ে আছে মিসেস চ্যালেঞ্জারের অচেতন দেহ। প্রফেসর সামারলি দ্রুতহাতে একটা অক্সিজেন সিলিণ্ডারের মুখ খুলছেন।

হিসহিস করে বেরোতে আরম্ভ করল প্রচণ্ড চাপে ইস্পাতের বোতলে ভরে রাখা অক্সিজেন। আধমিনিট পর বুকের চাপ কমে যেতে লাগল। সহজভাবে শ্বাস নিতে পারলাম। নড়ে উঠলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। হাসি ফুটল সামারলির মুখে। অক্সিজেনে কাজ হচ্ছে। চ্যালেঞ্জারের অনুমান ভুল হয়নি।

কিন্তু তিনি সেই যে গেছেন তো গেছেনই, ফেরার আর নাম নেই।

কয়েক মিনিট পর ফিরলেন, তবে ধুঁকতে ধুঁকতে। ঘরে ঢুকেই গড়িয়ে পড়লেন কার্পেটের ওপর। লর্ড জনকে ইঙ্গিত করলেন দরজাটা লাগিয়ে দিতে। ঘরের অক্সিজেন মেশানো বাতাসে লম্বা দম নিলেন কয়েকবার। গলা থেকে বেরোনো ঘড়ঘড় শব্দটা কমে এল। বিড়বিড় করে বললেন, 'গাধাটাকে এত করে বললাম সময়মত চলে আসতে, এল না!'

'কার কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করলেন লর্ড জন।

'অস্টিন। ওর জীবনীশক্তি একেবারেই কম। বিষের প্রথম ধাক্কায়ই বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। কপাল ঠুকে গেছে গাড়ির বাম্পারে। নাড়ি দেখলাম। থেমে গেছে। আর এনে কি লাভ?' গলাটা বোধহয় ধরে এল চ্যালেঞ্জারের। তাড়াতাড়ি সেটা চাপা দিলেন অন্য কথা বলে, 'আপনারা কেমন আছেন?'

কেউ জবাব দেবার আগেই নড়েচড়ে উঠলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। গোঙানি বেরোল মুখ দিয়ে। চোখ খুললেন। উঠে বসলেন ধড়মড়িয়ে। অবাক হয়ে তাকাতে লাগলেন সবার দিকে।

আমি তাকিয়ে আছি চ্যালেঞ্জারের দিকে। মনিবকে ঠিকই চিনেছিল অস্টিন। মুখে যতই গালাগাল করুন, যত খারাপ ব্যবহারই করুন মানুষের সঙ্গে, ভেতরটা তাঁর সত্যি কোমল। নইলে নিজের জীবন বিপন্ন করে অনাত্মীয় একজন ড্রাইভারের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছুটে যান!

আমাদের পাঁচজনের মধ্যে চ্যালেঞ্জারের জীবনীশক্তি বেশি। অক্সিজেন ফুসফুসে ঢুকতেই মুহূর্তে চাঙা হয়ে গেলেন তিনি। স্ত্রীকে ধরে তুলে সোফায় বসিয়ে দিলেন। ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস, 'জর্জ, আর কত দেরি?'

'জানি না। এত করে বললাম তোমাদেরকে সময়মত মেকাপ রুমে চলে এসো···আরেকটু হলেই তো শেষ হয়ে গিয়েছিলে। এতগুলো বছর একসঙ্গে কাটিয়ে শেষ বিদায়ের সময় আলাদা হয়ে যাওয়া কি ভাল লাগে! যাব যখন একসঙ্গেই যাব···জানো, অস্টিন মরে গেছে! ছুটে গিয়েছিলাম। বাঁচাতে পারলাম না,' চোখের কোণে পানি চিকচিক করে উঠল চ্যালেঞ্জারের। আড়াল করার চেষ্টা করলেন না।

নতুন এক চ্যালেঞ্জারকে দেখছি। উদ্ধত, গোঁয়ার, দুর্মুখ মানুষটার এ আরেক রূপ। এটাই আসল। ভয়ানক কুৎসিত চেহারার মানুষটিকে কেন প্রাণ দিয়ে

ভালবাসেন ওই মহিলা, এতদিনে বুঝলাম। এত অপমানের পরও অস্টিন কেন চাকরি ছেড়ে যায়নি, তা-ও বোঝা গেল।

হিসহিস করে বেরিয়ে যাচ্ছে অক্সিজেন। এতক্ষণে সেটা খেয়াল করলেন চ্যালেঞ্জার। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কারও কোন কষ্ট হচ্ছে?'

মাথা নাড়লাম সবাই।

'তারমানে স্বাভাবিক অক্সিজেন আছে এখন ঘরে। অহেতুক গ্যাস ছেড়ে রাখার কোন মানে নেই। যতটা সম্ভব কম খরচ করে টিকে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তাতে আয়ু বাড়বে। চুপচাপ বসে থাকুন সবাই। নড়াচড়া কম করবেন। তাতেও অক্সিজেন কম খরচ হবে। কারও কোন অসুবিধে হলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।'

সিলিন্ডারের মুখ বন্ধ করে দিলেন চ্যালেঞ্জার।

উত্তেজিত উৎকণ্ঠায় কাটল প্রায় পাঁচ মিনিট। যে যার অনুভূতি সম্পর্কে সজাগ। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার, 'উফ্, আবার আটকে আসছে···দম নিতে পারছি না!'

বুকে চাপ অনুভব করলাম আমিও।

সিলিন্ডারের মুখ খুলে আবার খানিকটা অক্সিজেন ছেড়ে দিলেন চ্যালেঞ্জার। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাবমেরিনে সাদা ইঁদুর রাখে নাবিকরা। পানির নিচে ডুবে থাকার সময় বাতাসে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে মানুষের আগে টের পায় এই ইঁদুর। সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়ে তোলা হয় সাবমেরিন। তুমি এখন আমাদের সাদা ইঁদুর। অক্সিজেনের অভাব সবার আগে তুমি টের পাচ্ছ। এখন কেমন লাগছে?'

'ভাল।'

'তারমানে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ এখনকার মত রাখলেই চলবে। প্রতি মিনিটে কতখানি অক্সিজেন দরকার, হিসেবটা বের করা গেলে আর কয় ঘণ্টা বাঁচব বুঝতে পারব। শুরুতে তাড়াহুড়া আর উত্তেজনায় কিছুটা বেশিই খরচ হয়ে গেছে।'

'তাতে খুব একটা ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না,' জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন লর্ড জন। দুই হাত প্যান্টের পকেটে। ঘুরে তাকালেন এদিকে। 'মরবই তো। কয়েক ঘণ্টা বেশি বেঁচে লাভটা কি? অহেতুক মানসিক কষ্ট।'

তাঁর সঙ্গে সুর মেলালেন মিসেস, 'লর্ড মন্দ বলেননি। নিশ্চিত জানি যখন মরবই, যন্ত্রণাটা ভোগ করছি কেন?'

কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন সামারলি। 'নিশ্চিত বলাটা ঠিক হবে না।'

ভুরু কুঁচকে সামারলির দিকে তাকালেন লর্ড জন, 'আপনার কি এখনও আশা বেঁচে যাবেন?'

'তা জানি না। তবে কয়েক ঘণ্টা বাঁচাটাও লাভ। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি না আমি।'

আমার দিকে তাকালেন চ্যালেঞ্জার, 'ম্যালোন, তোমার কি বক্তব্য? জানালা খুলে দেব?'

'না। মৃত্যুকে আমার ভীষণ ভয়।'

'আমার ভয়ও নেই, মানসিক যন্ত্রণাও নেই,' গম্ভীর কণ্ঠে চ্যালেঞ্জার বললেন, 'তবে অক্সিজেন না-ফুরানো পর্যন্ত আমিও ইচ্ছে করে মরতে যাচ্ছি না। পৃথিবীর দুর্গতি দেখার এ সুযোগ সারা দুনিয়ায় আমরাই শুধু পেয়েছি। এটা নষ্ট করতে আমি রাজি নই।'

চেয়ার টেনে জানালার কাছে বসলাম চারজনে। পেছনে সোফায় গা এলিয়ে রইলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। ঘরের বাতাস ভারি ঠেকতে আরম্ভ করেছে। কমে যাচ্ছে অক্সিজেন।

উঁকি দিয়ে দেখলাম, জানালার ঠিক নিচে ছোট্ট উঠানে দাঁড়িয়ে আছে চ্যালেঞ্জারের গাড়ি। ওটার পাশে হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে অস্টিন। এতদিনে সত্যি চাকরি শেষ হলো ওর। হাতে হোস পাইপটা ধরাই আছে। অনর্গল পানি বেরোচ্ছে পাইপের মুখ দিয়ে। উঠানটা ভিজে চুপচুপে। কোণের দিকে দুটো ছোট ছোট গাছ। গোড়ায় কয়েকটা পালকের বল পড়ে আছে। প্রতিটি বলের গা থেকে আকাশমুখো হয়ে আছে ছোট ছোট এক জোড়া পা। মহামৃত্যুর পরশ থেকে ছোটবড় কেউ বাদ যায়নি। পাখিরাও রেহাই পায়নি।

স্টেশনে যাওয়ার পথটার দিকে তাকালাম। পথের পাশে এক জায়গায় ঘাসের ওপর পড়ে আছে সেই আয়াটা। পেরামবুলেটরে শিশুটা অনড়। ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়াগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাটিতে। কোচবাক্সে বসা বুড়ো কোচোয়ানের দেহটা যেন একটা কাকতাড়ুয়া পুতুল, ঘাড় এলিয়ে পড়ে আছে। জানালার পাশে বসা তরুণ আরোহীকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দরজাটা খোলা। এক হাত দরজার হাতলে। শেষ মুহূর্তে বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করেছিল।

ফসলের খেতে পড়ে আছে কয়েকজন চাষী। গলফ-ফিল্ডে পড়ে আছে খেলোয়াড়েরা। বাড়ি পৌঁছার কপাল আর হয়নি। আকাশে একটা পাখিও নেই। শেষ বিকেলে পড়ন্ত রোদের আলোয় এমনিতেই প্রকৃতি হয়ে যায় কেমন বিষণ্ন। আজ আরও বেশি লাগছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। নিথর, নিস্তব্ধ চারদিক।

বাইরে বিষাক্ত বাতাস। ঘরে অক্সিজেন আছে ঠিকই, কিন্তু বড়জোর আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরই বাইরে পড়ে থাকা ওই মানুষগুলোর মত আমরাও শেষ হয়ে যাব। আমাদের প্রাণহীন দেহগুলো লুটিয়ে পড়বে চেরি রঙের কার্পেটে।

'ওই দেখো, আগুন!' চ্যালেঞ্জারের কথায় কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। আঙুল তুলে দেখালেন।

একটা খামার বাড়িতে আগুন লেগেছে। নিশ্চয় চুলা থেকে। নেভানোর কেউ নেই। ছড়িয়ে পড়ছে। আরও ছড়াবে। পোড়ানোর মত যা পাবে সব ভস্ম না করে দেয়া পর্যন্ত জ্বলবে। তা জ্বলুক। মানুষই যদি না থাকল বাড়িঘর দিয়ে কি হবে।

সামারলির দিকে তাকালেন চ্যালেঞ্জার, 'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছেন?' তাঁর কণ্ঠে উত্তেজনার আভাস।

ফিরে তাকালেন সামারলি, 'কি?'

'আগুন জ্বলছে!'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'কিছু বুঝতে পারছেন না?'

কপাল কুঁচকে গেল সামারলির, 'কি বুঝব?'

'এ জন্যেই মাথামোটা বলি আপনাকেও। কেন বুঝতে পারছেন না?'

'দেখুন, এ সময় ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে না,' কর্কশ কণ্ঠ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে বিফল হলেন সামারলি। 'যা বলার পরিষ্কার করে বলে ফেলুন।'

'তাহলে স্বীকার করছেন আপনার চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি?'

অন্য সময় হলে হয়তো খুব ধারাল একটা জবাব দিতেন সামারলি। কিন্তু এখন কি ভেবে তর্কাতর্কির মধ্যে গেলেন না। 'বেশি কি কম, জানি না। তবে আপনি কি বলতে চাইছেন, সেটা বুঝতে পারছি না।'

'এত সহজ কথাটা কেন যে মাথায় ঢুকছে না···যাকগে আমার মত ব্রেন তো আর সবার নেই। বলুন তো, আগুন জ্বলতে হলে কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দরকার।'

এইবার বুঝতে পারলেন সামারলি। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অক্সিজেন!'

'হ্যাঁ, অক্সিজেন। আগুন যখন জ্বলছে, বোঝা যাচ্ছে অক্সিজেন আছে বাতাসে। এ ভাবে মরে যাওয়ার কথা নয় মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণীর। ইথারের বিষটা কোন্ পর্যায়ের পরীক্ষা করতে পারলে বোঝা যেত অঘটনটা কেন ঘটল।'

'এখন আর করেও কোন লাভ নেই। মৃত মানুষকে কোনভাবেই বাঁচিয়ে তোলা যাবে না।'

জবাব দিলেন না চ্যালেঞ্জার। দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। বোঝা যাচ্ছে তাঁর বিশাল খুলির ভেতরের ভারি মগজটায় এখন তুমুল গতিতে ভাবনা চলেছে। পৃথিবীবাসীকে বাঁচিয়ে তোলার কোন উপায় খুঁজছেন হয়তো।

জঙ্গলের মাথায় ধোঁয়া দেখা গেল। লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন লর্ড জন, 'ট্রেনের ধোঁয়া! চলছে কি করে? ড্রাইভার মরেনি?'

এঞ্জিনের গুমগুম আওয়াজটা ঘরে বসেও শুনতে পাচ্ছি। বিপুল গতিতে ছুটে চলেছে মেলট্রেন। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি স্টেশনে দাঁড়ানো একটা মালগাড়ি। এক্সপ্রেসটাও কোন রকম সিগন্যাল না পেয়ে থামছে না, একই লাইনে ছুটছে। এতক্ষণে তো মালগাড়িটাকে দেখে ফেলার কথা ড্রাইভারের। গতি কমানোর চেষ্টা করার কথা। করছে না। তারমানে মারা গেছে। আপনাআপনি ছুটছে ট্রেন। নিয়ন্ত্রণের জন্য কেউ নেই। তীব্র গতিতে ছুটে গিয়ে মালগাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খেল। ভয়াবহ শব্দ। এতদূরেও থরথর করে কেঁপে উঠল বাড়িঘর। দেখতে পেলাম, চারদিকে ছিটকে পড়ল লাকড়ি, ইস্পাতের টুকরো, খণ্ডবিখণ্ড মানুষের দেহ। দুটো গাড়ির এঞ্জিন গেঁথে গেল পরস্পরের সঙ্গে। ফুলঝুরি হয়ে ঝরে পড়ল এঞ্জিনের জ্বলন্ত কয়লা।

লর্ড জনের চিৎকার শুনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। মর্মান্তিক দৃশ্যটা সহ্য করতে পারলেন না। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন, 'উফ্‌ফ্! এতগুলো মানুষ!'

'দুঃখ কোরো না,' স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কোমল কণ্ঠে বললেন

চ্যালেঞ্জার। 'মারা ওরা আগেই গেছে, ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে রওনা দেয়ার পর। এখন শুধু লাশগুলোকে ছিটকে পড়তে দেখলে।'

অনুমান করতে কষ্ট হলো না, এ ধরনের কাণ্ড এখন সারা পৃথিবীতেই ঘটছে। বাড়িঘরে আগুন লাগছে, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট করছে, তীরের কাছে পৌঁছে যাওয়া চলমান জাহাজ গুঁতো খেয়ে চুরমার হচ্ছে, আরও কত ধরনের দুর্ঘটনা যে ঘটছে তার কোন সীমা-সংখ্যা নেই।

আমার মনের কথা পড়তে পেরেই যেন বিষণ্ন শুকনো হাসি হাসলেন সামারলি। বললেন, 'কয়লা খনিতে শ্রমিকরা নিজেরাই কয়লা হয়ে যাবে। আজ থেকে বহু লক্ষ বছর পর এত মানুষের লাশ দেখে চমকে যাবে তখনকার ভূতত্ত্ববিদেরা। কার্বনিফেরাস স্তরে মানুষ কেন কয়লা হয়ে থাকবে, এ নিয়ে জোর আলোচনা চলবে বিজ্ঞানী মহলে। কেউ জানবে না কিছু। বুঝতে পারবে না। শুধুই অবাক হবে।'

'হবে না,' লর্ড জন বললেন। 'আমরাই শেষ প্রজন্ম। পৃথিবীতে আর কোনদিন মানুষ জন্মাবে না। মরা গ্রহে পরিণত হবে এটা। কোন ধরনের একটি প্রাণীও যদি বেঁচে না থাকে, নতুন প্রাণ আসবে কোত্থেকে?'

'ভুল বললেন লর্ড,' জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার। 'পৃথিবীর জন্মের পর তো দীর্ঘদিন কোন প্রাণী সৃষ্টি হয়নি। তারপর কোটি কোটি প্রাণীতে ভরে গেল। আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু প্রাচীন নিয়মে আবার প্রাণের সৃষ্টি হবে। অবশ্য যদি ইথারের বিষ বলয় থেকে বেরোতে পারে পৃথিবী।'

'সত্যি এ কথা বিশ্বাস করেন আপনি?' সন্দেহ প্রকাশ করলেন সামারলি।

'করি!' গম্ভীর হয়ে গেলেন চ্যালেঞ্জার। 'যেটা করি না, সেটা বলি না।' কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন সামারলির দিকে।

প্রমাদ গুণলাম। এই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও দুজনের বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে নাকি?

আমার আশঙ্কাই ঠিক হলো।

'জন্মাবে যে তার কি প্রমাণ আছে?' সামারলির গলায় তিক্ততা।

'কোটি কোটি বছর আগে প্রাণশূন্য পৃথিবীতে যে প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাই প্রমাণ।'

'এটা কোন প্রমাণ হলো না। স্রেফ চাপাবাজি।'

'কি শুরু করলেন আপনারা!' রেগে গেলেন লর্ড জন। 'বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে এখন চেঁচামেচি করে কোন লাভ আছে? অহেতুক অক্সিজেন খরচ।'

'তাতে আপনার কি?' আরও খেপে গেলেন চ্যালেঞ্জার। আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। কোন্ কাণ্ড বাধিয়ে বসেন! 'একজন কিছু না জেনে না বুঝে আমার সঙ্গে তর্ক করতে থাকবে, আর আমি তার জবাব দেব না?'

'না, দেবেন না,' শীতল কণ্ঠে বললেন লর্ড জন, 'কারণ এখন আর ওসবের কোন প্রয়োজন নেই। মরার পর আপনার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কোন কাজে আসবে না। বরং মৃত্যুর পর সত্যি আর কোন জগৎ আছে কিনা সেটা নিয়ে মাথা ঘামান।'

এ কথায় কাজ হলো। চুপ হয়ে গেলেন দুই বিজ্ঞানী। তবে বেশিক্ষণ মুখ বন্ধ

রাখতে পারলেন না চ্যালেঞ্জার। আবার শুরু করলেন আগের আলোচনা, 'প্রফেসর সামারলি, গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওরা মরছে না। ইথার ওদের কোন ক্ষতি করতে যদি না পারে তাহলেই তো উদ্ভিদকোষ থেকে আবার প্রাণী জন্ম নেবে।'

'তাতে আমাদের কি?' প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করল, 'আমরা তো আর তখন বেঁচে থাকব না।' কিন্তু জানি রেগে যাবেন, এই ভয়ে চুপ করে রইলাম। বাইরে তাকালাম। পাহাড়ের ঢালে যে বাড়িটাতে আগুন লেগেছিল, বাতাস সেটা থেকে আগুন উড়িয়ে নিয়ে আরেকটাতে লাগিয়েছে। খড়ের গাদা পেয়েছে বোধহয়। দাউ দাউ করে জ্বলছে।

'ভয়ঙ্কর অবস্থা!' কম্পিত গলা লর্ড জনের। তাঁকে এমন বিহ্বল হয়ে পড়তে দেখিনি জীবনে।

'খালি বাড়ি পুড়ছে, ভয়ঙ্করের আর কি হলো,' আমি বললাম।

'পুড়কগে, সেটা নিয়ে ভাবছি না। কিন্তু আগুন যে ভাবে ছড়াচ্ছে, এদিকেও চলে আসতে পারে। এ বাড়িটায় আগুন লাগলে জ্যান্ত পুড়ে মরব। বেরোতে গেলে মরব ইথারের বিষে।'

মিসেস চ্যালেঞ্জার বললেন, 'জর্জ, আমার মাথা আবার দপদপ করছে। শ্বাস নিতে পারছি না।'

'অক্সিজেন কমে গেছে।'

উঠে গিয়ে সিলিণ্ডারের মুখের চাবি ঘোরালেন চ্যালেঞ্জার। মিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শেষ। এটা খালি। একটাতে তিন ঘণ্টা। এখন বাজে আটটা। বাকি চারটে সিলিণ্ডারে চলবে আরও বারো ঘণ্টা। রাতটা ভালই কাটবে আশা করছি। মরব কাল সকাল নাগাদ। জীবনে আর একবার মাত্র সূর্যোদয় দেখতে পাব।'

এগিয়ে গিয়ে ছিটকানি খুলে দরজা সামান্য ফাঁক করলেন চ্যালেঞ্জার। বাইরের বাতাস ঢুকতেই শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেল সবার। আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। ইথার এখনও বিষাক্ত। তাড়াতাড়ি দরজা লাগিয়ে দিলেন আবার চ্যালেঞ্জার। জোরে জোরে দম নিয়ে সোফায় হেলান দিলেন আবার মিসেস। রক্ত ফিরে এল মুখে।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন চ্যালেঞ্জার। বললেন, 'শুধু অক্সিজেন বাঁচিয়ে রাখতে পারে না মানুষকে। পেটও কিছু চায়।'

ঘরে খাবার জমানো আছে। কয়েক মিনিট লাগল বের করতে। টেবিলে সাজিয়ে ফেললেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। ঠাণ্ডা মাংস, রুটি, আচার আর এক বোতল মদ। এতক্ষণ উত্তেজনায় চুপ করে ছিল পেট, খাবার দেখে চনমন করে উঠল। অস্বাভাবিক খিদে।

খেতে বসে কারণটা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন চ্যালেঞ্জার, 'দারুণ আবেগ-উত্তেজনায় দেহের অণু জখম হয়। অতিরিক্ত দুঃখ অথবা আনন্দের পর তাই মানুষের খুব খিদে পায়।'

'সেজন্যেই বুঝি কেউ মারা গেলে তার শেষকৃত্যের পর ভোজের আয়োজন

করে লোকে?' জানতে চাইলাম।

'হবে হয়তো।'

ছুরি দিয়ে ঠাণ্ডা মাংস কাটতে কাটতে বললেন লর্ড জন, 'বুনো অসভ্যেরাও কিন্তু শোকতাপের পর বেশি খায়। আইরুমী নদীর তীরে একবার দেখেছি সর্দারকে মাটি চাপা দিয়ে এসে আস্ত এক জলহস্তী খেয়ে ফেলেছে গাঁয়ের লোকে। নিউগিনির জংলীরা শোকের তাড়নায় যার জন্যে শোক তার লাশটাই খেয়ে ফেলে। নিজের মাকেও বাদ দেয় না।'

'কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ পশুরও অধম,' মন্তব্য করলেন সামারলি।

মায়ের কথায় আমার নিজের মা'র কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ বেঁচে নেই, জানা কথা। কল্পনায় দেখলাম, আয়ারল্যান্ডের এক কটেজে জানালার ধারে পিঠ-উঁচু চেয়ারে নেতিয়ে আছে মা। গায়ে শাল জড়ানো। কোলে লেসের টুপি, পাশে চশমা আর বই। নিজের অজান্তেই চোখ দুটো ভিজে উঠল। দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারলাম না।

বাইরে রাত নেমেছে। অন্ধকারে ঢেকে গেছে পৃথিবী। কালোর পটভূমিকায় দক্ষিণের গোলাবাড়িটার কমলা-লাল আগুনকে মনে হচ্ছে দোজখের আগুন। জীবনে তো ধর্মকর্ম কিছু করিনি। আর কয়েক ঘণ্টা পর পরপারের ওরকমই কোন অগ্নিকুণ্ডে গিয়ে প্রবেশ করতে হতে পারে, ভাবনাটা মাথায় আসতেই মায়ের দুঃখ ভুলে গেলাম। অজানা আতঙ্কে অসাড় হয়ে এল হাত-পা। কখনও যা করিনি সেটাই করলাম—মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করতে লাগলাম।

চার

আমি ঈশ্বরকে ডাকছি। লর্ড জন নীরবে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। মনের অবস্থা ভাল না সামারলির, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সোফায় এলিয়ে পড়ে আছেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। একটি মাত্র লোকের কোন বিকার নেই, তিনি প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। মৃত্যু যত এগিয়ে আসছে, আরও বেশি স্থির, অনেক বেশি শান্ত হয়ে পড়ছেন। অকারণ বসে না থেকে অণুবীক্ষণে অ্যামিবার জীবন-পরিক্রমা পর্যবেক্ষণ করছেন। বৈদ্যুতিক আলোয় চকচক করছে যন্ত্রের তলার দিকের ছোট্ট গোল কাঁচের স্লাইডটা।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। যন্ত্র থেকে চোখ সরিয়ে সামারলির দিকে তাকালেন। 'প্রফেসর, জলদি আসুন! কাণ্ডটা দেখে যান!'

কি দেখলেন চ্যালেঞ্জার? দারুণ কৌতূহলে সামারলির আগেই লাফ দিয়ে উঠে প্রায় ছুটে গেলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি?'

আমার দিকে তাকালেন চ্যালেঞ্জার। 'তুমি তো কিছু বুঝবে না।' আমাকে হতাশ হয়ে যেতে দেখে বোধহয় মায়া হলো। 'ঠিক আছে, এসো। দেখো। বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি।'

অণুবীক্ষণের আই-পিসে চোখ ঠেকালাম। হিজিবিজি কতগুলো চিত্র ফুটে

উঠল চোখের সামনে। বলে দিলেন চ্যালেঞ্জার, 'মাঝের ছোট ছোট জিনিসগুলোকে বলে ডায়াটম। উদ্ভিদ। ওগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ডানে দেখো, অতি ধীরে নড়ছে একটা জিনিস। এটাই অ্যামিবা। দেখেছ?'

কাঁচের গায়ে চোখ ঠেকানো অবস্থায় মাথা নাড়া যায় না। মুখে বললাম, 'দেখেছি।'

ঘষা কাঁচের মত অস্বচ্ছ একটা অতি খুদে প্রাণী আলোকিত বৃত্তের মাঝের চটচটে বস্তুর ওপর ভেসে থেকে নড়ছে।

আমি সরে জায়গা করে দিতে এগিয়ে এলেন সামারলি। দেখতে লাগলেন।

কেবল লর্ড জনের কোন আগ্রহ নেই। নিজের জায়গায় বসে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'অ্যামিবা দেখিয়ে কি বোঝাতে চান, প্রফেসর?'

যন্ত্র থেকে চোখ সরিয়ে সামারলি বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও সেটাই জিজ্ঞাসা।'

'এত বড় জীববিজ্ঞানী হয়েও সহজ ব্যাপারটা বুঝলেন না?' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন চ্যালেঞ্জার, দাড়িতে ঝাঁকি লাগল। 'খানিক আগে আপনি প্রমাণ চেয়েছিলেন না, কি করে আবার প্রাণের জন্ম হবে? এই যে সেই প্রমাণ। গতকাল এই অ্যামিবাকে স্লাইডে রেখে বাতাসহীন জায়গায় বন্দি করে রেখেছিলাম। ওর বাক্সে অক্সিজেন ঢোকেনি, কিন্তু ইথার ঢুকেছে। ভয়ঙ্কর বিষে শ্বাস নিয়েছে এটা। তারপরও দিব্যি বেঁচে আছে। তারমানে অ্যামিবাদের কোন ক্ষতিই করতে পারছে না ইথারের বিষ।'

'তাতে আমাদের লাভটা কি?' কোন পরিবর্তন নেই লর্ড জনের চেহারায়।

'লাভটা কি মানে?' অবাক চোখে লর্ডের দিকে তাকালেন চ্যালেঞ্জার। করুণা করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'আরে সাহেব, আজ নাহয় সবাই মরে গেছে। কিন্তু কয়েক লক্ষ বছর পরে এই অ্যামিবারাই আবার বিশাল বিশাল প্রাণী সৃষ্টি করবে। এককালে যেমন করেছিল। এক অর্থে আমাদের পূর্বপুরুষ বলা যেতে পারে এদেরকে। আমাদের পরে আবার যারা জন্মাবে তাদেরও পূর্বপুরুষ। মহাকালের কাছে কয়েক লক্ষ বছর কিছুই না। যদি বেঁচে থাকতে পারতেন, দেখতে পেতেন আজকের মতই আরেকটা প্রাণিজগৎ সৃষ্টি করে বসে আছে এই আণুবীক্ষণিক অ্যামিবারাই।'

'বলেন কি!' আগ্রহী না হয়ে আর পারলেন না লর্ড জন। চেয়ার থেকে উঠে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। মাইক্রোস্কোপের আই-পিসে চোখ রেখে দেখতে দেখতে বললেন, 'আমাদের আদিমতম পূর্বপুরুষ, তোমার পিঠে ওটা কি? শার্টের বোতাম!'

'কালোমত দেখতে তো?' শিশুকে যেন বর্ণ পরিচয় শেখাচ্ছেন চ্যালেঞ্জার, 'ওটা নিউক্লিয়াস।'

নিউক্লিয়াসের ব্যাখ্যা আর শুনতে চাইলেন না লর্ড জন। যন্ত্র থেকে চোখ তুলে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে তাহলে এখনও কোটি কোটি প্রাণী বেঁচে আছে, উদ্ভিদ ছাড়াও। জীবন্ত প্রাণী বলতে আমরা পাঁচজনই শুধু নই?'

'না, আরও অনেকে আছে।'

'তাতে অবশ্য আমাদের কিছু এসে যায় না,' নিতান্ত স্বার্থপরের মত বললেন

লর্ড জন। খানিক আগে আমিও এ কথা ভেবেছিলাম। 'অক্সিজেন ফুরালে আমরা মরে যাব। বেঁচে থাকবে এই অ্যামিবা। হিংসে হচ্ছে আমার।'

'বিজ্ঞানী হলে অবশ্য এ কথা বলতেন না। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ভেবে খুশি হতেন।'

'আপনি হচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলেন সামারলি।

'নিশ্চয়।'

'মিথ্যে কথা। এসব স্রেফ ভণ্ডামি। নিজে মরে গেলাম, আর ভবিষ্যতে পৃথিবী ফুলেফলে ভরে উঠল, ভাবলে তো বরং রাগই লাগতে থাকে। ভাল লাগা দূরের কথা। লর্ড জনের সঙ্গে আমিও একমত। আমি মরে গেলে ভবিষ্যতে যা খুশি হোক পৃথিবীর, তাতে আমার কি?'

মনে মনে খুশি হলাম ভেবে, আমার মত একই ভাবনা ভাবছে আরও দুজন।

ভণ্ড বলাতে রেগে গেলেন চ্যালেঞ্জার। 'কোন বিজ্ঞানী যে এতটা স্বার্থপর হতে পারে, এই দেখলাম। পৃথিবীতে ভবিষ্যতে প্রাণের জন্ম হলে আপনার কিছু না?'

'না, আমার কিছু না,' সামারলির সাফ জবাব। 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম।'

হাত নেড়ে বললেন চ্যালেঞ্জার, 'আপনি আসলে বিজ্ঞানী নন। কয়েকটা বিশেষ বিশেষ বই মুখস্থ করে ফেললেই বিজ্ঞানী হওয়া যায় না।' ভয় পেলাম। রেগে গিয়ে বেচারা সামারলিকে ধরে না এখন জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন। কিন্তু তেমন কোন অঘটন ঘটালেন না তিনি। বরং শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়ে স্ত্রীর পাশে বসে পড়লেন।

যাক, একটা ফাঁড়া কাটল, ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি আর লর্ড জন। জানালার কাছে বসে বাইরে তাকালাম।

রাতের পৃথিবী। মরা পৃথিবী। রাত অনেক দেখেছি জীবনে। কিন্তু আজকের মত আর দেখিনি। আর কোনদিন দেখবও না।

চাঁদের আলোর বন্যা বইছে। জ্যোৎস্নাধোয়া বিষণ্ন রাত। তারার আলোও মলিন। আসলে হয়তো কোন পরিবর্তন ঘটেনি চাঁদ কিংবা তারার আলোর, কিন্তু আমার চোখে ফ্যাকাসে লাগল। মন ভাল না যে।

খামার বাড়িটা এখনও জ্বলছে। পশ্চিম দিগন্তে লাল আলোর ফুটকি। অরুনডেল, চিকেস্টার, পোর্টসমাউথেও মনে হয় বাড়িঘরে আগুন লেগেছে।

অদ্ভুত শান্ত চারদিক। নিশাচর পাখির ডাক নেই। ঝিঁঝিরা স্তব্ধ। রাতের কোন শব্দই নেই কোথাও। বড় উদাস হয়ে গেল মনটা। এতদিন কত ফালতু ফালতু ব্যাপার নিয়ে সিরিয়াস হয়ে উঠেছি ভেবে হাসি পেল অহেতুক মানুষে মানুষে হানাহানি, মারামারি, হই-চই। অ্যাংলো-জার্মান সাঁতার প্রতিযোগিতা—কোন ব্যাপার হলো এটা? অথচ এই অতি সাধারণ ঘটনাটা নিয়ে কি হুজ্জতটাই না করল লোকে। মন্ত্রী হয়ে কি লাভ? কিংবা প্রেসিডেন্ট? কিংবা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী? শেষ পরিণতি তো এই! ঠাস করে পড়ে মরে যাওয়া! ব্যস, সব জারিজুরি খতম!

বাইরের মরা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কত কথা ভাবছি। মনে পড়ছে ম্যাকারডলকে। টেবিলে মাথা রেখে পড়ে আছে হয়তো তাঁর লাশ, কিংবা গড়িয়ে

পড়েছে নিচে। সম্পাদক বিউমন্ট নিশ্চয় নিজের অফিস ঘরে লাল-নীল টার্কিশ কার্পেটে পড়ে আছেন। রিপোর্টার রুমেরও একই হাল; পাশাপাশি পড়ে আছে ম্যাকডোনা, মুরে, বন্ড। ছড়ানো হাতের কাছে নোটবুক। কোনদিন কোন কাজে আসবে না আর ওগুলো। এই যে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল পৃথিবীর, এসব খবর আর কোনদিন লিখতে পারবে না ওরা, ছাপা হবে না কোন পত্রিকায়।

এমনি হাজারো সব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ভেতর। সময় কাটছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে নিশ্চিত মৃত্যু।

অনেক আদর করে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে স্ত্রীকে ঘুম পাড়িয়েছেন চ্যালেঞ্জার। একটা সোফা ঠেলে ঘরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে ওটাকে আড়াল করে পর্দা টেনে দিয়েছেন। স্ত্রীকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছেন সোফায়। অত কুৎসিত হয়েও কি করে স্ত্রীর মন জয় করেছেন তিনি, বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না এখন আর।

তারপর বই আর কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন তিনি। শান্ত, তন্ময়, ভাবগম্ভীর মূর্তি। কাজে ডুবে গেছেন মুহূর্তে। সামনে যে নিশ্চিত মৃত্যু ভুলেই গেছেন যেন।

চেয়ারে এলিয়ে পড়ে ঘুমাচ্ছেন সামারলি। নাক ডাকছে বিশ্রী শব্দে।

লর্ড জনও চেয়ারে বসে ঢুলতে শুরু করলেন। অবাক লাগল আমার। এমন পরিস্থিতিতে লোকে ঘুমায় কি করে?

খানিক পর আমার চোখও ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ মাথা ঝাড়া দিয়ে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলাম। হাতঘড়িতে দেখি রাত তিনটে। ওরে বাবা, এতক্ষণ ঘুমিয়েছি! নিজের ওপরই রাগ হলো। এমন একটা রাত, জীবনের শেষ রাতের বড় একটা অংশ ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম! আর কতক্ষণই বা বাঁচব!

তবে একটানা পাঁচ ঘণ্টা ঘুমানোয় বেশ ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। অন্যেরা কে কি করছেন দেখলাম। পর্দার আড়ালে রয়েছেন এখনও মিসেস চ্যালেঞ্জার। টেবিলে মাথা রেখে চ্যালেঞ্জারও ঘুমিয়ে পড়েছেন। দেখার মত দৃশ্য। চেয়ারে হেলে পড়েছে প্রকাণ্ড কাঠামো। ওয়েস্ট কোটের পেটের কাছটায় আলতো ভাবে পড়ে আছে রোমশ দুই হাত। মাথাটা পেছন দিকে হেলানো। কয়েক গোছা ঘন চুল এসে পড়েছে মুখের ওপর। গলার ওপর চুল এবং লোম ছাড়া আর কিছু নেই। মুখ-চোখ-নাক কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। চুল-দাড়ি-লোমের একটা বল মনে হচ্ছে। চওড়া বুকের গভীর থেকে গর্জন করে বেরিয়ে আসছে নিঃশ্বাস।

ঘুমাচ্ছেন সামারলি। লর্ড জনেরও ঘুম ভাঙেনি। বাইরে আরও বিষণ্ন হয়ে গেছে প্রকৃতি। পুবের আকাশ আবছা ধূসর।

তাকিয়ে আছি। জীবনের শেষ ভোর।

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো পুবের আকাশ। জ্যোৎস্না মলিন হলো। কেটে গেল ধূসর ছায়া। উজ্জ্বলতা হারাল চাঁদ। ভোর যে এত সুন্দর খেয়াল করিনি কোনদিন।

আলো ফুটল। বহুদূরে দিগন্তের ওপারে ছোট পাহাড়ের ওপাশ থেকে উঁকি দিল ভোরের সূর্য। কয়েক মুহূর্ত জড়সড় হয়ে থেকে যেন লজ্জা কাটাল। তারপর

দ্রুত পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লাল ভাঁটার মত। সোনালী আলোর বন্যায় ভেসে গেল মরা পৃথিবী। আলোটা অন্য দিনের মতই জ্যান্ত। কিন্তু ভোরের গান গাইছে না আজ পাখ-পাখালি, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে না নবাগত সূর্যকে।

প্রাণভরে দেখলাম সূর্যোদয়। মানুষের চোখে শেষ সূর্য। আজকের পরও সূর্য উঠবে, অস্তও যাবে যথানিয়মে, আলো ছড়াবে পৃথিবীর বুকে, কিন্তু সে আলোয় কারও কোন লাভ হবে না। সাগরে জোয়ার আসবে, প্রান্তরে কানাকানি করবে বাতাস। আগের মত ধরাবাঁধা নিয়মেই চলবে প্রকৃতি, কিন্তু ভোগের জন্যে কোন প্রাণী থাকবে না।

নিচে উঠানের দিকে তাকাতে আবার চোখে পড়ল অস্টিনকে। গোটা মানুষ জাতটার নিয়তির প্রতীক যেন বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে থাকা ওই লাশ—বড়ই করুণ। মরা মানুষ আর মরা কুকুরের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পেলাম না এ মুহূর্তে।

ঠিক এই সময় বুকে চাপ অনুভব করলাম। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলোর দিকে তাকালাম। চমকে উঠলাম। তিনটে খালি। রাতে চতুর্থটা খুলে দিয়েছিলেন চ্যালেঞ্জার। এখন ওটাও শেষ। ফুরিয়ে আসছে অক্সিজেন, সেই সঙ্গে আমাদের জীবন। দ্রুত ধেয়ে চলেছে অন্তিম মুহূর্তের দিকে।

শ্বাসরোধ হয়ে আসার ভয়ঙ্কর অনুভূতিটা আরও জোরদার হচ্ছে। খামচে ধরছে ফুসফুসকে। শেষ সিলিন্ডারটার কাছে ছুটে গেলাম। মুখ খুলতে গিয়ে মাথায় এল চিন্তাটা। যদি না খুলি? ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুর ওপারে চলে যাবে চার-চারজন মানুষ। ক্ষতি কি? যাক না? ঘুমের মধ্যে শান্তিতে মরতে তো পারল। আমি নাহয় জেনেবুঝে কষ্ট পেয়েই মরলাম। শেষ মুহূর্তে হিরো হবার একটা অদম্য লোভ জাগল।

কিন্তু সেটা হতে দিলেন না চ্যালেঞ্জারের সাদা ইঁদুর। চিৎকার করে উঠলেন, 'জর্জ, জর্জ, আমি দম নিতে পারছি না!'

ঘুম ভেঙে গেল বাকি সবার।

সিলিন্ডারের মুখ খুলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। চ্যালেঞ্জারকে দেখে হাসি পেল। রোমশ দুই হাত মুঠো করে চোখ রগড়াচ্ছেন। বিশালকায় গরিলা শিশুর মত। সামারলিও কম হাস্যকর নন। ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে সোজা হয়ে বসেছেন। কাঁপছেন ঠকঠক করে। পালাজ্বরে আক্রান্ত রোগীর মত। বিজ্ঞান সাধকের বৈজ্ঞানিক চেহারার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই আর।

ধাতস্থ রয়েছেন একমাত্র লর্ড জন। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তাঁবুতে রাত কাটিয়ে জাগলেন। হরিণের পাল দেখে যেন কেউ চিৎকার করে তাঁর ঘুম ভাঙাল। বন্দুক নিয়ে বেরোতে হবে এখনই।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন চ্যালেঞ্জার। ভোরের আকাশ আর সূর্য দেখতে লাগলেন ধ্যানমগ্ন হয়ে।

ধীর পায়ে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁর মিসেস। স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, পৃথিবীর জীবন তো শেষ হলো। জর্জ, সেই গানটা তোমার মনে পড়ে?…সেই যে, বাজাও ঘণ্টা, পালাক প্রাচীন; ঘণ্টা বাজাও, আসুক

নবীন।'

জবাব দিলেন না চ্যালেঞ্জার। নীরবে মাথা ঝাঁকালেন শুধু।

আমাদের দিকে তাকালেন মিসেস। 'আপনারা ঘুমোননি নাকি সারারাত?'

'সবাই ঘুমিয়েছি,' জবাব দিলাম আমি। 'সামারলি আর লর্ড জন সারারাত। আমার ঘুম ভেঙেছে রাত তিনটের দিকে।'

'ইস্, আপনারা মেহমান, চেয়ারে রাত কাটিয়েছেন! আর নিজের বাড়িতে স্বার্থপরের মত সোফায় আরাম করে নাক ডাকিয়েছি আমি।'

'কিচ্ছু অসুবিধে হয়নি। কোন্‌দিক দিয়ে কেটে গেছে রাতটা, টেরই পাইনি।'

'বললেই হলো। কষ্ট নিশ্চয় হয়েছে। ঠিক আছে, প্রায়শ্চিত্ত করছি,' বলে স্টোভের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্টোভে বসানো কেটলির পানি ফুটতে সময় লাগল না। পাঁচ কাপ ধূমায়িত কফি বানিয়ে ট্রেতে করে নিয়ে এলেন। একটা কাপ তুলে দিলেন আমার হাতে। সত্যি, তুলনা হয় না মহিলার। সময়মত আসল জিনিসটা এনে হাজির করেছেন।

কফি শেষ করে চ্যালেঞ্জারের কাছে পাইপ ধরানোর অনুমতি চাইলেন সামারলি। ভেবেছিলাম, নিষেধ শুনতে হবে। কিন্তু জীবনের শেষ ইচ্ছেয় বাধা দিলেন না চ্যালেঞ্জার। মাথা কাত করে অনুমতি দিলেন।

পাইপ ধরালেন সামারলি। আমি আর লর্ড ধরালাম সিগারেট। সতেজ হয়ে এল ক্লান্ত স্নায়ু। বদ্ধ ঘর তামাকের কটু ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভারি হলো ঘরের বাতাস। দম আটকানোর অবস্থা। খুকখুক করে কেশে উঠলেন মিসেস। ধোঁয়া বের করার জন্যে দড়ি টেনে ভেন্টিলেটর সামান্য ফাঁক করলেন চ্যালেঞ্জার। ধোঁয়া কমে যেতে আবার বন্ধ করলেন।

'আর কতক্ষণ?' জানতে চাইলেন লর্ড জন।

'বড় জোর আর ঘণ্টাখানেক,' জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার।

'একটু প্রার্থনা করলে কেমন হয়, জর্জ?' মিসেস বললেন।

'তোমার ইচ্ছে,' গলায় তেমন জোর নেই চ্যালেঞ্জারের। 'আমি ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। যেভাবে যেদিকে খুশি নিয়ে যায় যাক। জন্মটা যেহেতু আমার হাতে ছিল না, মৃত্যু ঠেকানোরও ক্ষমতা নেই, অহেতুক এ নিয়ে অনুযোগ-অভিযোগ করে লাভ কি? যা হয় হবে।'

দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে গিলে নেয়া ধোঁয়াটুকু নাকমুখ দিয়ে বের করলেন সামারলি। খকখক তরে বেদম কাশলেন পনেরো সেকেণ্ড। তারপর কর্কশ গলায় বললেন, 'ভাগ্যের হাতে সঁপে দেয়া কিংবা প্রসন্ন মনে আত্মনিবেদনের মত মনের অবস্থা আমার নেই। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই হাল ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কমপক্ষে আরও একটা বছর বাঁচার ভীষণ প্রয়োজন ছিল আমার। খড়ি-জীবাশ্মগুলোকে শ্রেণী অনুযায়ী সাজিয়ে ফেলার কাজটা বাকি রয়ে গেছে এখনও।'

'আপনার খড়ি-জীবাশ্ম, আর আমার বই,' চ্যালেঞ্জার বললেন। 'সবে লেখা শুরু করেছিলাম। সারা জীবনের পড়াশুনা, অভিজ্ঞতার সারমর্ম থাকত ওই বইয়ে। অতবড় যুগান্তকারী সৃষ্টিটা শেষ করে যেতে পারলাম না। পারলে ভাল হতো।'

'কাজ আমাদের সবারই কিছু না কিছু বাকি রয়ে গেল,' বললেন লর্ড জন।

'আগামী বসন্তে তিব্বতে তুষার-চিতা মারতে যাবার কথা ছিল। হিমালয়ের ইয়েতির খোঁজও করে আসতাম। পারলাম কই!' আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ম্যালোন, তোমার কিছু বাকি নেই?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকালাম, 'একটা কবিতার বই লিখছিলাম। শেষ হলো না।'

'আপনাদের সবারই কিছু না কিছু বাকি রয়ে গেল,' মিসেস চ্যালেঞ্জার বললেন। 'কিন্তু আমার নেই। মরতে খারাপও লাগছে না। জর্জকে নিয়েই তো আমার সংসার। ও যখন সঙ্গে যাচ্ছে, যেখানেই যাই, নতুন ধরনের আরেকটা সংসার আবার সাজিয়ে নিতে পারব।'

বাইরে সবুজ ঘাসে শিশির-ভেজা রোদ। মাঠের আল ধরে হেঁটে আসতে বড় সাধ হলো। কিন্তু সেটা অসম্ভব। দরজা খুললেই মারা পড়ব। জীবনের এই অতি সাধারণ শেষ ইচ্ছেটাও আর পূরণ করা হবে না কোনদিন।

আবার ভারি হয়ে উঠছে ঘরের বাতাস। যাবার সময় হয়ে এল।

'অক্সিজেন শেষ,' ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে বললেন লর্ড জন।

'সিলিন্ডারটায় গ্যাস কম ছিল,' চ্যালেঞ্জার বললেন। 'চুরি করার জন্যে অনেক সময় বোতলে গ্যাস কম ভরে দেয় কোম্পানি। মরে গিয়ে বেঁচে গেল ব্যাটা। নইলে এখনই গিয়ে দিতাম মামলা ঠুকে।'

'দেয়াই উচিত হতো। ওটা আমার কেনা। নগদ পয়সা দিলাম। তারপরেও ঠকাল। নইলে আরও কয়েক মিনিট বাঁচা যেত,' মেজাজ সাংঘাতিক খারাপ হয়ে গেছে সামারলির। 'এ যুগের চরম শঠতার দৃষ্টান্ত। এখন আর ব্যাটাদের শাস্তি দেবারও কোন উপায় নেই। সবকটা হারামখোর মরে শক্ত হয়ে গেছে।'

সামারলির কথায় কান দিলেন না চ্যালেঞ্জার। স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকলেন, 'কাছে এসো।' তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরে রেখে আমাদের দিকে তাকালেন, 'কষ্ট শুরু হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে বাড়বে। তারচেয়ে জানালা খুলে দিই। মরতে দেরি হবে না।'

'তা ঠিক। ভুগে ভুগে মরার চেয়ে একবারে মরে যাওয়াই ভাল,' বললেন লর্ড জন।

সামারলির দিকে তাকালেন চ্যালেঞ্জার, 'আপনার কি মত, প্রফেসর?'

মাথা ঝাঁকালেন সামারলি, 'যেতেই যখন হবে, কি আর করা, দিন খুলে! তা বন্ধু, অনেক ঝগড়া করেছি, অনেক তর্ক করেছি। কিছু মনে রাখবেন না। বিদায়!'

উঠে দাঁড়ালেন চ্যালেঞ্জার। এগিয়ে গেলেন জানালার দিকে। পাল্লার জোড়া আর ফাঁকফোকর সব প্লাস্টার দিয়ে আটকানো। খুলতে দেরি হবে। ওসব ঝামেলার মধ্যেই গেলেন না তাই তিনি। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'যে মহাশক্তির হাতে আমাদের সৃষ্টি, তাঁর কাছেই ফিরে চললাম!' বলেই প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলেন জানালার কাঁচে। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচ। কিছু ভাঙা টুকরো ঘরের ভেতর পড়ল। বাকিটা পড়ল বাইরে।

ভয়ানক বিষাক্ত বাতাস নাকে ঢোকার অপেক্ষায় রইলাম।

তার পরিবর্তে অক্সিজেনে ভরা মিষ্টি হাওয়া ঢুকল আমাদের ফুসফুসে। বুকের চাপ হালকা হয়ে গেল। পরিষ্কার হয়ে গেল মাথার ভেতর। দূর হয়ে গেল

ঝিমঝিম ভাবটা।

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম। কতক্ষণ থ হয়ে রইলাম, জানি না। স্বপ্নের ঘোরে যেন চ্যালেঞ্জারের কথা কানে এল, 'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ইথারের বিষবলয় পেরিয়ে এসেছে পৃথিবী। আর ভয় নেই। মরব না আমরা।'

পাঁচ

দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসা সামুদ্রিক তাজা হাওয়ায় সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল আমাদের। বাঁচার আনন্দের মোহময় ভাবটা কেটে যেতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমরা পাঁচজন বেঁচে থেকেই বা কি লাভ? পরিচিত পৃথিবীর আর সবাই তো মরে গেছে।

নিষ্ঠুর নির্মম সত্যটা স্পষ্ট, নিখুঁতভাবে ফুটে উঠল মনের পর্দায়। নীরব আতঙ্কে পাশের বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সবার চোখেই অসহায়তা, দ্বিধা, ভয়। বিশ্বের জীবিত প্রাণী কেবল আমরা কয়জন। আনন্দ-উল্লাস করতে পারছি না, বরং ভেসে গেলাম বিমর্ষতার বন্যায়। মুষড়ে পড়েছি নিবিড় নৈরাশ্যে। পৃথিবীতে যা কিছু ছিল, যা কিছু ভালবেসেছিলাম, তার বেশির ভাগই নেই, ভেসে গেছে ইথারের বিষ বলয়ের ধ্বংসাত্মক মহাসমুদ্রে। আমরা কয়জন রয়ে গেছি এক বিশ্ব-মরুদ্বীপে, যেখানে আশা নেই, ভরসা নেই, নেই খেয়ে-পরে বাঁচার কোন প্রত্যাশা। মানুষের লাশের বিশ্ব-শ্মশানে ক্ষুধার্ত শেয়ালের মত হন্যে হয়ে ঘোরার পর আমাদের ভাগ্যেও জুটবে বিলম্বিত, নিষ্ঠুর, ভয়াবহ মৃত্যু। আপাতত বেঁচে থাকাটা হবে আরেক মানসিক যন্ত্রণা।

ককিয়ে উঠলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার, 'জর্জ, কেন বাঁচালে এ ভাবে? সবার সঙ্গে মরে যাওয়াটাই ছিল অনেক ভাল! এখন যে তিলে তিলে ধুঁকে মরব?'

গভীর চিন্তায় মগ্ন চ্যালেঞ্জার। বিশাল দুই ভুরু কুঁচকে উঠেছে। প্রকাণ্ড রোমশ থাবায় স্ত্রীর হাত চেপে ধরলেন। নীরবে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাঁকে। ভারি গলায় বললেন, 'বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারলে মনের যন্ত্রণা অনেকখানি কমে।'

'কিন্তু আমি মানতে পারছি না,' সামারলি প্রতিবাদ করলেন।

'না মেনে কি করবেন?' বললেন লর্ড জন। 'বেঁচে গেছি আমরা, এটাই এখন বাস্তবতা।'

'কিন্তু বেঁচে থেকে আর কি লাভ?' ভোঁতা স্বরে বললাম। 'খবরের কাগজ যেখানে নেই, সেখানে বাঁচব কি নিয়ে?'

'একটা শিকারও নেই আর এত্তবড় দুনিয়াটায়,' ঘাড় গুঁজে বললেন লর্ড জন। 'তারমানে আমার অস্তিত্বও বৃথা।'

'ছাত্র নেই, বায়োলজি নেই, আমারও কোন প্রয়োজন নেই আর,' বললেন সামারলি।

'তবে আমার কিছুই হারায়নি,' অনেকখানি সামলে নিয়েছেন মিসেস

চ্যালেঞ্জার। 'স্বামী আছে, ঘর আছে, সংসার আছে। বাঁচতে আমার অসুবিধে হবে না।'

'আমারও না,' বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন চ্যালেঞ্জার। 'বিজ্ঞান তো মরেনি। আমার বেঁচে থাকার জন্যে বিজ্ঞানই যথেষ্ট। বিপর্যয়ের পর দুরূহ সমস্যা তৈরি করে ব্রেনকে বাঁচিয়ে রাখার খোরাক আরও বেশি করে জুগিয়ে যাবে এই মরা পৃথিবী। আমার জন্যে বরং ভালই হলো।'

জানালা খুলে দিলেন তিনি।

নিস্পন্দ, নীরব, নিথর পৃথিবীর দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলাম আমরা।

'গতকাল বিকেল ঠিক তিনটের পর বিষবলয়ে ঢুকেছিল পৃথিবী,' চ্যালেঞ্জার বললেন। 'এখন বাজে নয়টা। ঠিক কখন বেরিয়েছি বিষের ভেতর থেকে, সেটাই প্রশ্ন!'

'ভোরের দিকেও বাতাস ভীষণ ভারি লাগছিল,' বললাম।

'সকাল আটটায় শ্বাস নিতে খারাপ লেগেছে আমার,' বললেন মিসেস।

'তারমানে, ধরা যেতে পারে আটটার পরে বিষবলয় থেকে বেরিয়েছে পৃথিবী,' বললেন চ্যালেঞ্জার। 'ঝাড়া সতেরো ঘণ্টা বিষাক্ত ইথারে ডুবে ছিল। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা মানুষকে সতেরো ঘণ্টা ধরে মেরে শেষ করেছেন বিশ্বকর্তা। প্রাণশূন্য করেছেন পৃথিবীটাকে। কিন্তু সত্যি কি সব মারতে পেরেছেন? আমাদের মত হতভাগা কি আর নেই পৃথিবীর কোথাও?'

'আমিও তাই ভাবছি,' বললেন লর্ড জন। 'আর কেউ কি নেই?'

'না, নেই,' জোর দিয়ে বললেন সামারলি। 'থাকা সম্ভব নয়। আমাদের মত অক্সিজেন নিয়ে ঘরে আবদ্ধ থাকার চিন্তাটা নিশ্চয় আর কারও মাথায় আসেনি।'

'কি করে শিওর হচ্ছেন?'

'কারণ অন্য কেউ আগে থেকেই আবিষ্কার করতে পারেনি পৃথিবীর বিষবলয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে পৃথিবী।'

মুচকি হাসলেন চ্যালেঞ্জার, 'তাহলে স্বীকার করছেন, পৃথিবীর সেরা ব্রেন একমাত্র আমারই আছে?'

চুপ করে ভাবলেন সামারলি। দ্বিধা করলেন। মাথা নাড়লেন। 'না, করছি না। যতক্ষণ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ না পাব যে এই পদ্ধতিতে আর কেউ বেঁচে নেই, ততক্ষণ করব না।'

'ইথারের বিষও আপনার মাথাটাকে ধোলাই করতে পারেনি। অযথা তর্ক করার ভূতটা দূর আর হবে না কোনদিন।'

'মাথায় আমার কোনকালেই ভূত ছিল না। যেটা সত্যি, প্রমাণ পাব, সেটা মানতে আমার আপত্তি নেই।'

'তর্ক থাক,' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লেন লর্ড জন। 'এ সব আলোচনা ভাল্লাগছে না এখন। বরং জবাব দিন, আমাদের ভোগান্তির কি শেষ হলো? নাকি আবার আঘাত হানবে ইথারের বিষ?'

সারসের মত গলা বাড়িয়ে আকাশ আর দিগন্ত দেখলেন সামারলি। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বললেন, 'আকাশের রঙ গতকালও ঠিক এমনই ছিল। ভোগান্তির শেষ

কিনা, বলা যায় না এখনও। দেখা গেছে ভূমিকম্পের একটা ধাক্কা শেষ হতে না হতেই আরেক ধাক্কা এসে হাজির। প্রথমটার চেয়ে আরও ভয়াবহ। আবার যে গিয়ে আরও দীর্ঘ আরেকটা বিষাক্ত বলয়ে ঢুকবে না পৃথিবী, তা কে বলতে পারে!'

'যা হয় হবে,' চ্যালেঞ্জার বললেন। 'আপাতত বেঁচে আছি, এটাই যথেষ্ট। অহেতুক তর্কাতর্কি না করে বরং নিচে গিয়ে অস্টিনের লাশের একটা ব্যবস্থা করা যাক।'

বেরোলাম সবাই বদ্ধ ঘর থেকে। কাটিয়েছি চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়। অথচ মনে হলো কত যুগ পর ঘর থেকে বেরোলাম।

অস্টিনকে ধরাধরি করে নিয়ে এলাম। কপালে কাটা একটা দাগ। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। শক্ত হয়ে গেছে শরীর। বয়ে আনতে বেশ কষ্ট হলো। মাটিতে রাখতে মন চাইল না। শুইয়ে দিলাম তার বিছানায়।

গত একটা দিন ভয়াবহ মানসিক উত্তেজনা গেছে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। খিদেও পেয়েছে খুব। খাবার ঘরে ঢুকলাম। টেবিলে প্রচুর খাবার সাজানো। খেতে বসে গেলাম।

লর্ড জন বসলেন না। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। 'আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন?' জানতে চাইলেন চ্যালেঞ্জার।

'চারদিকে এত লাশের ছড়াছড়ি। গলা দিয়ে খাবার নামে নাকি এ অবস্থায়?'

'তাহলে কি করতে চান?'

'চলুন, বরং বেরিয়ে পড়ি। দেখা যাক আর কেউ বেঁচে আছে কিনা।'

'ভাল প্রস্তাব। কিন্তু ঘুরতে হলে গায়ে শক্তি দরকার। খাবার ছাড়া শক্তি পাবেন না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাবার টেবিলে বসলেন লর্ড। রুটি চিবাতে চিবাতে বললেন, 'লন্ডনে গেলে কেমন হয়?'

'ভালই হয়,' সামারলি বললেন, 'কিন্তু চল্লিশ মাইল হাঁটবেন কিভাবে?'

'হাঁটব কেন? প্রফেসরের গাড়ি আছে না।'

'কে চালাবে সেটা, শুনি? অস্টিন তো লাশ।'

চ্যালেঞ্জার বললেন, 'পৃথিবীতে আর কেউ যদি বেঁচে না থাকে এখন আমাদের পাঁচজনকেই বেঁচে থাকার জন্যে অনেক রকম কাজ করতে হবে। গাড়িটা নাহয় আমিই চালানোর চেষ্টা করব।'

আঁতকে উঠলেন তাঁর মিসেস, 'ওকাজও করতে যেয়ো না! আমি তোমাকে কিছুতেই গাড়ি চালাতে দেব না। সেবারের কথা মনে নেই, শিখতে গিয়ে যে পয়লা চোটেই গেটটা উড়িয়ে দিয়েছিলে?'

'একবার উড়িয়েছি বলে যে বার বার ওড়াব, এমন কোন কথা নেই। ছড়াটা মনে নেই: ঘোড়ায় চড়িল, আছাড় খাইল, আবার চড়িল...'

'ছড়া বাদ দিন,' হাত নেড়ে বললেন সামারলি, 'আপনি ড্রাইভার হলে আমি ওগাড়িতে বসছি না। ইথারের বিষ থেকে বেঁচে গিয়ে এখন শরীরটাকে ভর্তা করে মরতে চাই না।'

'তাহলে বসে থাকুন এখানেই। মৃত লন্ডন আর দেখা হবে না।'

চ্যালেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে বললেন লর্ড জন, 'ড্রাইভার একজন দিতে পারি আমি।'

চমকে উঠলাম। 'দিতে পারেন মানে? আরও কেউ বেঁচে আছে নাকি, যে গাড়ি চালাতে পারে?'

'আছে। আমি। ড্রাইভিং যেদিন শিখেছিলাম, সেদিন কি ভাবতে পেরেছিলাম গোটা মানুষ জাতটার ড্রাইভার হতে হবে আমাকে!'

ঠিক দশটায় রওনা হলাম আমরা। ড্রাইভিং সীটে লর্ড জন। পাশে আমি। পেছনের সীটের মাঝখানে মিসেস চ্যালেঞ্জার, দুপাশে দুই প্রফেসর। বসার এই ব্যবস্থাটা মিসেসই করেছেন। আশঙ্কা, দুই প্রফেসর পাশাপাশি বসলে তর্কাতর্কি করে শেষে হাতাহাতি না বাধিয়ে দেন। কোন বিশ্বাস নেই ওঁদের।

শুরু হলো এক আজব মোটর চালনা! সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ পৃথিবীতে মানুষ নামক জীবটির আবির্ভাবের পর এমন বিচিত্র পরিস্থিতিতে আর কেউ কোনদিন মোটর-অভিযানে বেরোয়নি।

দিনটা সুন্দর। আগস্টের সোনাঝরা সকাল। সাগরের ফুরফুরে হাওয়া গায়ে লাগছে। ঝকঝকে নীল পরিষ্কার আকাশ। সবুজে ছাওয়া সাসেক্সের বনানী। প্রকৃতির এ রূপ দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না গোটা পৃথিবী জুড়ে এমন একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। বোঝা যায় না, এই পৃথিবী আমাদের চির পরিচিত সেই আগের পৃথিবী নয়। অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ চারদিক। শব্দ বলতে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। বিকট হয়ে কানে বাজছে।

খুব খারাপ লাগছে আমার। গ্রামাঞ্চলের চির পরিচিত সেই পরিবেশ আর নেই। পাখি ডাকছে না। পোকামাকড়ের গুঞ্জন, মানুষের কথা, গরু-ভেড়ার ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, কিচ্ছু নেই। এ যেন মৃত্যুপুরীর ভয়াবহ নিঃশব্দতা।

হেলেদুলে আকাশে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। এখনও পুড়ছে বাড়িঘর। মনটা যে কেমন করছে এ সব দেখে, ভাষায় বোঝানোর ক্ষমতা নেই।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিক ওদিক পড়ে আছে জন্তু-জানোয়ার-মানুষের অগুনতি লাশ। দাঁত খিঁচিয়ে, বীভৎস নীল মুখে বিদ্রূপের হাসি নিয়ে সবাই যেন আমাদের দেখছে। গায়ের রক্ত হিম-করা সে-দৃশ্য।

মাঠের ধারে পাশাপাশি পড়ে আছে ছয়জন চাষী। নিষ্প্রাণ দৃষ্টি আকাশের দিকে।

একটা স্কুলের পাশ দিয়ে যাবার সময় ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এত লাশ দেখে আমারই চোখে পানি এসে গেল, আর মিসেস তো মেয়েমানুষ। বাস্তবিক, ঈশ্বর বড় নিষ্ঠুর!

পাকা হাতে গাড়ি চালাচ্ছেন লর্ড জন। তবে গতি মন্থর। ইচ্ছে করেই আস্তে চালাচ্ছেন। দেখতে দেখতে চলেছেন। যেদিকে তাকানো যায় শুধু লাশ আর লাশ। বাড়িঘরের সামনে লাশ, রাস্তায় লাশ। একজায়গায় তো এত বেশি লাশ পড়ে আছে, রাস্তাই বন্ধ করে দিয়েছে। হোক মৃত, ওদের মাড়িয়ে তো আর যাওয়া যায় না। নেমে গিয়ে ধরাধরি করে লাশ সরিয়ে রাস্তা সাফ করলাম। আবার

এগোল গাড়ি।

সাসেক্স আর কেন্টের হাইওয়ে ধরে চলার সময় পথের ওপর আর দুপাশে অনেক মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে পড়ল। কয়েকটা বিশেষ চিত্র মনে গেঁথে গেল। সাউথ বোরো গ্রামে সরাইখানার সামনে একটা ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। দামী, বিশাল গাড়ি। ব্রাইটন কিংবা ইস্টবোর্নের দিক থেকে এসেছে। সামনের সীটে তিনজন যুবক। পেছনের সীটে তিনজন রূপসী তরুণী। একজনের পাশে কালো একটা পিকিং স্প্যানিয়েল। সব মরা। ধনী-নির্ধন, মানুষ-জন্তু একাকার হয়ে গেছে মৃত্যুর মহিমায়।

আরেকটা মর্মান্তিক দৃশ্য দেখলাম সেভেনোক্সে। রাস্তার বাঁ দিকে এক বিরাট কনভেন্ট। সামনের আঙিনা সবুজ ঘাসে ছাওয়া। ঘাসের ওপর পড়ে আছে সারি সারি বাচ্চা ছেলেমেয়ে, স্কুলের ছাত্র ছিল ওরা। সামনের কাতারে পড়ে আছে সাদা পোশাক পরা দশ-বারোজন মহিলা। নান। সবার সামনে একজন বয়স্কা মহিলা। বেশভূষা আর চেহারায় বোঝা যায় ইনি ছিলেন মাদার সুপিরিয়র। মৃত্যু আসছে বুঝতে পেরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সবাই ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্যে।

এমনি সব রোমহর্ষক, মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। চ্যালেঞ্জার আর সামারলিও তর্ক ভুলে গেছেন। মিসেস চ্যালেঞ্জার নীরবে কাঁদছেন। গাড়ি চালানোয় মগ্ন লর্ড জন। চেহারা দেখে তাঁর মনের অবস্থা ঠাহর করতে পারছি না, তবে ভাল যে নয় সেটা অনুমান করা যায় স্টীয়ারিং হুইলে চেপে বসা আঙুল দেখে। রক্ত সরে গেছে। সাদা দেখাচ্ছে আঙুলগুলো।

লুইসহ্যাম পেরিয়েছি, ওল্ডকোটও পেরোতে যাচ্ছি, এমন সময় পাশের একটা বাড়ির বন্ধ জানালার কাঁচের ওপারে একজন মানুষের ছায়া চোখে পড়ল। কনুইয়ের খোঁচায় লর্ডকে দেখালাম। গাড়ি থামিয়ে দিলেন জন। আমাদের দাঁড়াতে দেখে জানালার ওপাশ থেকে হাত নাড়ল ছায়াটা। এক ঝটকায় গাড়ির দরজা খুলে ফেলে বাড়ির দরজার দিকে ছুটলাম আমি। আমার পিছনে এলেন লর্ড জন। গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন অন্য তিনজনও।

চোখের পলকে ফুটপাথ পেরিয়ে খোলা সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ালাম। একবার ধাক্কা দিতে খুলে গেল দরজা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধা। চেহারা দেখে সঠিক বয়েস অনুমান করার উপায় নেই, তবে একশোর নিচে নয় কিছুতেই। ভারি লেন্সের চশমা পরা অতি শীর্ণ মুখ।

আমাদের ঘরে ঢোকার জন্যে তাড়া দিলেন। আমরা ঢুকতে দ্রুত আবার দরজা লাগিয়ে দিলেন। জানালার কাছে চেয়ারে বসে ছিলেন তিনি। দেয়ালের গা ঘেঁষে রাখা একটা অক্সিজেন সিলিণ্ডার। ভীষণ অবাক হলাম। ইথারের বিষকে ঠেকাতে পারে অক্সিজেন, কি করে জানলেন তিনি?

একটা বিশেষ দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জারের দিকে তাকালেন সামারলি। বুঝিয়ে দিলেন, পৃথিবীতে তাঁর ব্রেনটাই একমাত্র ব্রেন নয়, যেটা বুঝতে পেরেছিল ইথারে বিপর্যয় ঘটতে যাচ্ছে।

কিন্তু নির্বিকার মুখ করে রইলেন চ্যালেঞ্জার।

আমাদের চেয়ারে বসতে বলে বৃদ্ধা বললেন, 'আর সহ্য হয় না এ ভাবে ঘরে বসে কাটানো। কিন্তু কি করব, বাইরের বাতাস বড় খারাপ…'

'এখন আর খারাপ নেই,' লর্ড জন বললেন। 'বিষ কেটে গেছে। দেখছেন না আমরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সতেরো ঘণ্টা বেঁচেছি বদ্ধ ঘরে, সিলিন্ডারে করে অক্সিজেন নিয়ে গিয়ে। আপনার মত।'

মুখ দেখে মনে হচ্ছে লর্ডের কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না বৃদ্ধা। জিজ্ঞেস করলেন, 'মানুষগুলো এ ভাবে মরে গেল কেন বলুন তো? কি রোগ? মহামারীই তো মনে হচ্ছে।'

'বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে…'

'তাই নাকি!' উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন বৃদ্ধা। 'বড় ভাবনার কথা…তাতে লন্ডন অ্যান্ড নর্থওয়েস্টার্ন রেলওয়ের শেয়ারের দর পড়ে যাবে না তো?'

অন্য সময় হলে হাসতাম। এ মুহূর্তে পারলাম না। বোঝা গেল বৃদ্ধা এখনও ধারণাই করতে পারেননি কি ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটে গেছে পৃথিবীতে।

কথা বলে জানা গেল মহিলার নাম মিসেস বার্সটন। বিধবা। এ বাড়িতে ভাড়া থাকেন। সামান্য কিছু শেয়ার রেখে গেছেন স্বামী। ওগুলোর লাভ থেকে কোনমতে খাওয়া-পরা জোটে। শেয়ারের দর নিয়ে ভাবনা কেন বোঝা গেল।

বুঝিয়ে বললাম, শেয়ারের দাম নিয়ে মাথা ঘামানোর আর কোন প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে করলে এখন দুনিয়ার সমস্ত টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদের মালিক হতে পারেন তিনি। বেরিয়ে গিয়ে কেবল নিয়ে এলেই হয়। কিন্তু ওসব সম্পদ এনেও তা থেকে আর কোন সুবিধে পাবেন না।

পরিস্থিতি কিছুতে বোঝানো গেল না তাঁকে। হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। বিলাপ শুরু করলেন, 'হায় হায়, শেয়ারেরই যদি দাম না থাকে, কি খেয়ে বাঁচব আমি! ওই কটা শেয়ার ছাড়া যে আর কিছুই নেই আমার…'

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চুপ করালাম বৃদ্ধাকে। জিজ্ঞেস করলাম, অক্সিজেন নিয়ে বসে থাকার চিন্তা কিভাবে মাথায় এল তাঁর?

বললেন, চিন্তাটা তাঁর মাথায় আসেনি, ডাক্তার এই ব্যবস্থা দিয়েছেন। হাঁপানী আছে। সে জন্যে সারাক্ষণ অক্সিজেন রাখেন ঘরে। শুঁকতে হয় একটু পর পর। ঠাণ্ডা লাগলেই বাড়ে। সেজন্যে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখেন। বিষাক্ত ইথারের কথা কিছুই জানেন না।

কাজকর্ম কিছু নেই। যতক্ষণ জেগে থাকেন, বেশির ভাগ সময় কাটান জানালার ধারে বসে। রাস্তায় পটাপট পড়ে গিয়ে মরে যেতে দেখেছেন অনেক মানুষকে। ভেবেছেন কোন মারাত্মক রোগের শিকার হয়েছে ওরা। এমনিতেই জানালা কম খোলেন। মানুষকে ওভাবে মরতে দেখে রোগটা ছোঁয়াচে ভেবে ভয়ে আর একটিবারের জন্যেও খোলেননি জানালা। পুরো পৃথিবীটাই যে এখন মৃত, কল্পনাও করতে পারছেন না। অনেকবার বললাম, বিশ্বাস করাতে পারলাম না। থেকে থেকে শুধু একটি কথাই বলতে লাগলেন, শেয়ারের দর যদি পড়ে যায়, কি খেয়ে বাঁচবেন…

আর বসে থাকার কোন মানে হয় না। বৃদ্ধার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার

গাড়িতে চাপলাম।

টেমস নদীর দিকে যতই এগোচ্ছি, রাস্তায় লাশের পরিমাণ বাড়ছে। বাধার পর বাধা। লাশ সরানোর জন্যে বার বার নামতে হচ্ছে। লন্ডন ব্রিজ পেরোতে রীতিমত ঘাম ছুটে গেল। মিডলসেক্সের কাছাকাছি রাস্তায় এলোপাতাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ফাঁকে পথ করে নিতে গিয়ে লর্ড জনের অবস্থা কাহিল। ব্রিজের তলায় নদীতে একটা জাহাজ জ্বলছে। ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার। কয়লা আর তেলপোড়া গন্ধে বাতাস ভারি। পার্লামেন্ট হাউসের কাছাকাছিও জ্বলছে কিছু। দূর থেকে বোঝা গেল না কি পুড়ছে। ধোঁয়া উঠছে আকাশে।

এঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থামিয়ে দিলেন লর্ড জন। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'মৃত লন্ডন শহরের চেয়ে গ্রাম অনেক ভাল। অনেক শান্তির। আপনাদের কেমন লাগছে জানি না, আপনারা কি করবেন তা-ও জানি না; তবে আমার দেখা শেষ হয়েছে; আর সহ্য করতে পারছি না। আমি এখন রোদারফিল্ডে ফিরে যেতে চাই।'

'আমারও ভাল লাগছে না,' তিক্তকণ্ঠ সামারলির। 'এত্ত লাশ! চলুন, চলে যাই?'

'আমি যেতে চাই না,' গমগম করে উঠল চ্যালেঞ্জারের অস্বাভাবিক মোটা গলা। 'ওই বৃদ্ধার মত আরও কেউ বেঁচে থাকতে পারে। দেখা দরকার।'

'থাকলেও খুঁজে বের করবে কিভাবে?' জানতে চাইলেন মিসেস। 'লাশের মধ্যে গাড়িই চালানো যাচ্ছে না। ঘুরবে কি করে?'

'চলো, হাঁটি।'

এই মৃত নগরীতে ঘুরতে ইচ্ছে করল না। তবু চ্যালেঞ্জারের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিতে হলো। গাড়ি থেকে নামলাম আমরা। ঘুরতে শুরু করলাম। কিং উইলিয়াম স্ট্রীটের ফুটপাথে লাশের স্তূপ। পা ফেলার জায়গা নেই। কোনমতে লাফিয়ে ডিঙিয়ে পার হয়ে এসে একটা বিরাট ইনশিওরেন্স বিল্ডিঙে ঢুকলাম। ওপরতলার বারান্দা কিংবা ছাত থেকে শহরটা ভালমত দেখার জন্যে।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে সবচেয়ে ওপরের ঘরটায় উঠে এলাম। মস্ত গোল টেবিলের চারধারে কার্পেটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন আটজন প্রৌঢ়। চেহারা আর বেশভূষা দেখে বোঝা যায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এঁরা। নিশ্চয় কোন জরুরী মীটিঙে বসেছিলেন। শেষ করতে পারেননি। তার আগেই মৃত্যু এসে হানা দিয়েছে।

ঘর পেরিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরোলাম। এখান থেকে লন্ডন শহরের অনেকখানি চোখে পড়ে। যেদিকে চোখ যায়—ফুটপাথে, রাস্তায়, বাড়ির আঙিনায় শুধু মানুষের লাশ। ঘরের মধ্যে দমবন্ধ লাগায় তাজা হাওয়ার জন্যে অনেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে। রাস্তায় যানবাহনের ভিড় বুঝিয়ে দিচ্ছে লন্ডন ছেড়ে পালাতে চেয়েছিল সবাই। ভেবেছিল, শহরটা ছেড়ে যেতে পারলেই বুঝি বাঁচা যাবে।

গির্জা চোখে পড়ল। বিশাল ঘণ্টাটা দেখে একটা বুদ্ধি এল মাথায়। বাজালে কেমন হয়? জ্যান্ত কেউ থেকে থাকলে ঘণ্টা শুনে ছুটে আসতে পারে।

চ্যালেঞ্জারকে বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন তিনি।

ছুটে বেরোলাম ঘর থেকে। লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে।

অনেক বড় ঘণ্টা। এত ভারি যে একা শেকল টেনে নড়াতেই পারলাম না। লর্ড জনও এসে হাত লাগালেন। তাতেও ঘণ্টা অনড়। শেষে চ্যালেঞ্জার আর সামারলিও এগিয়ে এলেন। চারজনের মিলিত শক্তিকে আর উপেক্ষা করতে পারল না ঘণ্টা। এত জোরে শব্দ হলো যেন কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবে। থামলাম না আমরা। বাজিয়ে চললাম। প্রচণ্ড আওয়াজে ডেকে ডেকে যেন বলতে লাগল ওটা, 'বেঁচে আছ নাকি কেউ? জলদি এসো! এখানে তোমাদের মত আরও কয়জন আছে!'

গম্ভীর, প্রচণ্ড শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে বহুদূর। নিস্তব্ধতার মাঝে সে-শব্দকে লাগছে কামানের গর্জনের মত। ভয় লাগছে রীতিমত। কাঁপছে বুকের ভেতরটা।

ঝাড়া আধঘণ্টা শেকল টেনে ঘণ্টা বাজালাম আমরা। চ্যালেঞ্জার তো রীতিমত আসুরিক নাচ নাচলেন। সে-দৃশ্য ভুলতে পারব না কোনদিন। বেঁটে মানুষ। শেকল টানতে গিয়ে লাফিয়ে উঠতে হচ্ছে। শেকল ধরে রেখেই ঝুলে ঝুলে নেমে আসছেন। বাঁদর যেমন লতা ধরে ঝোলে, সেরকম। অন্য সময় হলে এ দৃশ্য দেখে হেসে কুটিকুটি হতাম।

পরিশ্রমে ঘেমে গেলাম। বার বার তাকাচ্ছি সদর দরজার দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা হয়ে গেল। কিন্তু কেউ এল না। কেউ সাড়া দিল না। নিঃসীম হতাশায় হাহাকার করে উঠল বুকের ভেতর। নেই, কেউ বেঁচে নেই!

'আর এক মুহূর্তও এখানে নয়, জর্জ!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। অসহ্য লাগছে তাঁর। 'জলদি রোদারফিল্ডে চলো! নইলে পাগল হয়ে যাব!' দুহাতে মুখ ঢাকলেন তিনি। 'ঈশ্বর! এ কি করলে!'

গির্জা থেকে বেরিয়ে এলাম।

চুপচাপ হেঁটে গেলাম গাড়ির কাছে।

ছয়

রোদারফিল্ডে ফিরেছি।

চ্যালেঞ্জারের পড়ার ঘরটা নিস্তব্ধ নিঝুম। শুধু দেয়াল ঘড়িটার টিকটিক শব্দ প্রচণ্ড জোরে কানে বাজছে। বিষাদের পাহাড়ে যেন চাপা পড়েছে আমার সমস্ত সত্তা। ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো কিছুতে তাড়াতে পারছি না মন থেকে। ভেঙে পড়েছি। মন থেকে নামাতে পারছি না বিষণ্নতার বোঝা।

খোলা জানালার পাশে চেয়ারে একা বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছি আর ভাবছি। বন্ধুরা সব নিচে। হলঘরে। আর কদিন বাঁচব?–ঘুরেফিরে এই একটা প্রশ্নই মনে আসছে বার বার। মৃত পৃথিবীতে এ ভাবে বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর। পদার্থ বিদ্যায় আছে, বৃহত্তর বস্তু ক্ষুদ্রতম বস্তুকে কাছে টানে। মানুষ

জাতটার বৃহত্তর অংশটাই চলে গেছে, বেঁচে আছি শুধু আমরা গুটি কয়েক হতভাগ্য জীব, নিজেদের মহামূর্খতার কারণে। বৃহৎ অংশের টানে আমরা যাব কবে? কিভাবে? নতুন করে আবার হানা দেবে না তো মহাবিষ? পৃথিবীর তাবৎ মড়াগুলো পচে-গলে নতুন বিষ ছড়িয়ে দেবে বাতাসে, পানিতে। তাতেও দূষিত হবে বাতাস। বায়ু আর পানি দূষণের কারণেও মারা যেতে পারি। আর তাতেও যদি না মরি, তো পাগল হয়ে যাব নির্ঘাত। কিংবা আত্মহত্যা করব। ভয়াবহ এই মরা পৃথিবীতে বেশিদিন মনের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব নয় কোনমতেই।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। ঘোড়ার পায়ের শব্দ! তাকিয়ে দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়াগুলো। গাড়ি টেনে নিয়ে উঠে আসছে। সাঁইসাঁই চাবুক হাঁকাচ্ছে কোচোয়ান। বুঝলাম, পাগল হয়ে গেছি। মাথার ঠিক নেই, তাই আবল-তাবল দেখছি।

সাঁঝের গান গেয়ে উঠল পাখির দল। নিচের উঠানে কাশির শব্দ শুনলাম। অসম্ভব দৃশ্য। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে অস্টিন। টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে।

পাহাড়ের ঢালে আবার পেরামবুলেটর ঠেলছে আয়াটা। গলফ-ফীল্ডে উঠে দাঁড়িয়েছে খেলোয়াড়েরা। চাষীরাও জীবন্ত! এ-কি কাণ্ড! চিমটি কাটলাম নিজের হাতে। ব্যথা পেলাম। না, জেগেই তো আছি।

নিচের হলঘরে যাওয়ার জন্যে দৌড় দিলাম।

সেখানে আরেক বিচিত্র দৃশ্য। আনন্দের বন্যা বইছে। সবার সঙ্গে আন্তরিকভাবে হাত মেলাচ্ছেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। আমাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন চ্যালেঞ্জার। মনে হলো ভালুকের আলিঙ্গন।

তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন লর্ড জন, 'প্রফেসর, ঘটনাটা কি বলুন তো? সত্যি দেখছি, না পাগল হয়ে গেছি!'

মৃদু মৃদু হাসছেন চ্যালেঞ্জার। মাথা নেড়ে বললেন, 'না, সত্যি দেখছেন।'

বাইরের উঠানে বেরিয়ে এলাম। গাড়ির বনেট তুলে গজগজ করছে অস্টিন। 'পাজী, বজ্জাত, ছুঁচো! দেখাব মজা!'

'কি হয়েছে, অস্টিন?' জিজ্ঞেস করলেন চ্যালেঞ্জার।

'লুব্রিকেটর খুলে থুয়ে গেছে। নিশ্চয় মালীর ছেলেটার কাজ! আবার হাত দিয়েছে গাড়িতে!'

লর্ড জনের দিকে তাকালেন চ্যালেঞ্জার। চোখ দুটো মিটিমিটি হাসছে। অপরাধীর মত হাত কচলাতে লাগলেন লর্ড। 'মালীর ছেলে নয়, অস্টিন, অপরাধটা আমার।'

অবাক চোখে লর্ডের দিকে তাকাল অস্টিন। কিছু বুঝল না। চ্যালেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল, স্যার। দম আটকে আসছিল। হোসপাইপ দিয়ে গাড়ি ধুতে ধুতে মাথা ঘুরে উঠেছিল হঠাৎ। আপনি বললেন, সন্ধ্যার মধ্যে পৃথিবীর সব প্রাণী মারা পড়বে। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ঘরে কখন গেছি, কি করে গেছি, জানি না। কপাল কেটে গেছে কি করে যেন!'

অল্প কথায় সব বুঝিয়ে বললেন চ্যালেঞ্জার।

হাঁ হয়ে গেল অস্টিন। মনিবের প্রতিটি কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করল। জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাংক অভ ইংল্যান্ডের সামনে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ!'

'ভেতরে ঢুকেছিলেন?'

'না।'

'আমি হলে ঢুকতাম। বস্তা বস্তা টাকা নিয়ে আসতে পারতাম। কেউ বাধা দেয়ার ছিল না। ইস, কেন যে আপনার কথামত আগেই ঘরে গিয়ে বসে থাকলাম না!' বলেই ঠোঁট ওল্টাল। 'থাকগে, এখন আর আফসোস করে লাভ নেই।'

গেটের কাছে এসে দাঁড়াল ঘোড়ার গাড়িটা। লাফ দিয়ে নামল ভেতরের আরোহী। ঘণ্টা বাজাল। এগিয়ে গেল অস্টিন। আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞেস করল। তারপর একটা কার্ড হাতে নিয়ে ফিরে এল। বাড়িয়ে ধরল চ্যালেঞ্জারের দিকে। আগন্তুকের ভিজিটিং কার্ড।

এক পলক দেখেই ফোঁস করে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। জেগে উঠল যেন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। রাগে মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠলেন, 'রিপোর্টার! এখন কি? আগে তো আমার কথা বিশ্বাস হয়নি···ভেবেছ পাগলের প্রলাপ···' অস্টিনকে বললেন, 'যাও, গেট আউট করে দিয়ে এসো! যেতে না চাইলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।'

'দেখা করলে দোষ কি?' নিরীহ মুখভঙ্গি করে বললাম।

খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'দেখা করব মানে? ও ব্যাটা সাংবাদিক! খবরের কাগজের লোক। আস্ত শয়তান। আর নামের কি ছিরি! জেমস বাক্সটার!'

'আমিও তো খবরের কাগজের লোক···'

'তুমিও একটা···' শয়তান বলতে গিয়েও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন চ্যালেঞ্জার। 'না, তুমি অবশ্য ব্যতিক্রম।'

'তাহলে দেখা করবেন না?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম আবার।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ বেরোচ্ছে চ্যালেঞ্জারের গলা দিয়ে। গোঁয়ারের মত মাথা নেড়ে বললেন, 'রিপোর্টার জাতটাই খারাপ। বিষাক্ত পেশা। এদের হাতে ক্ষমতা থাকলে ভদ্রলোকদের জন্যে কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। তুমিও তো সাংবাদিক, তুমিই বলো, কোনদিন এরা আমার কোন কাজের প্রশংসা করেছে?'

'আপনিও তো কোনদিন ওদের প্রশংসা করেননি,' সাহস করে মুখের ওপর খোঁচাটা দিয়ে দিলাম। 'চেঁচামেচি না করে নিজে যে একজন ভদ্রলোক সেটা অন্তত বুঝিয়ে দিন ওকে। এতটা পথ কষ্ট করে এসেছে শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করার আশায়। সেটা কি আপনাকে সম্মান দেয়া হলো না?'

আমার যুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে গজগজ করতে লাগলেন চ্যালেঞ্জার, 'বেশ, করব দেখা। তবে তোমাকেও আসতে হবে সঙ্গে। যা বলার তুমি বলবে। শুধু তুমি বলাতে কথাটা রাখলাম, এরপর যদি কেউ আসে আর সহ্য করব না বলে দিচ্ছি!'

আমার পেছন পেছন মুখ কালো করে গেটের কাছে এলেন তিনি।

চ্যালেঞ্জারের চরিত্র জেনেশুনে তৈরি হয়েই এসেছে বাক্সটার। চালাক লোক।

তাড়াতাড়ি নোটবুক বের করল। তোয়াজ করে নরম গলায় বলল, 'আমি লন্ডনের কেউ নই। পৃথিবীর আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আমেরিকার মানুষ আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। আমি তাদের প্রতিনিধি।'

তোয়াজ, নরম কথা, কোন কিছুতেই মন টলল না চ্যালেঞ্জারের। আমেরিকারই হোক আর যে দেশেরই হোক, লোকটা সাংবাদিক। আর প্রফেসরের কাছে সব সাংবাদিকই এক। আমাকে মুখ খোলারও সুযোগ দিলেন না। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'পৃথিবীর আর কোন আসন্ন বিপদ আছে বলে আমার জানা নেই।'

বোকার মত হাঁ করে চ্যালেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে রইল বাক্সটার। 'বিষাক্ত ইথারের বলয়ে পৃথিবীর ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা আছে, আপনিই তো বলেছিলেন?'

'বলেছিলাম। কিন্তু সে-ধরনের কোন বিপদের সম্ভাবনা এখন আর নেই।'

ঘাবড়ে গেল সাংবাদিক। ভুল লোকের কাছে চলে এসেছে ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি কি প্রফেসর চ্যালেঞ্জার?'

'আপনার কি মনে হয়?'

'বাড়ির গেটে তো এই নামই দেখলাম!'

'চোখ তাহলে ঠিকই আছে। আপনার অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখছি, বাড়িটা আমার। গেটের নেমেপ্লেটটাও আমারই নামে।'

'সরি, স্যার। তাহলে আপনি বলছেন আর কোন বিপদ নেই? আজকের টাইমস পত্রিকায় ছাপা আপনার চিঠিতে কিন্তু অন্য কথা বলেছেন।'

'ওটা আজকের নয়, কালকের,' শুধরে দিলেন চ্যালেঞ্জার।

'কালকের!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল সাংবাদিকের।

'চিঠি পড়েই কি ছুটে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আসার পথে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছেন?'

'করেছি। ইংরেজদের এমন পাগল হয়ে যেতে এর আগে কখনও দেখিনি।'

'আর কিছু?'

'না তো! আর কিছু তো তেমন মনে পড়ছে না!'

'ভিক্টোরিয়া থেকে কটায় বেরিয়েছিলেন?'

'সোয়া দুটো। কিন্তু এ সব প্রশ্ন…'

'ট্রেন থেকে নেমেই ঘোড়ার গাড়ি নিয়েছিলেন?' বাক্সটারকে কথা বলতে না দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন চ্যালেঞ্জার।

'হ্যাঁ।'

'এখান থেকে স্টেশন কদ্দূর?'

'মাইল দুয়েক তো হবেই।'

'দুই মাইল আসতে কতক্ষণ লাগল? এখন কটা বাজে?'

চমকে উঠল সাংবাদিক। তাই তো, এটা তো খেয়াল করেনি! এখন যে সন্ধে সোয়া ছ'টা। দুমাইল পথ আসতে ঘোড়ার গাড়িতে বড়জোর পৌনে এক ঘণ্টা লাগার কথা।

'প্রফেসর, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না…'

আবার বাধা দিলেন চ্যালেঞ্জার, 'পাহাড়ে ওঠার সময় শরীর খারাপ লাগছিল? মনে করে দেখুন তো?'

এক মুহূর্ত ভাবল বাক্সটার। তারপর মাথা দুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। আর বুকে অদ্ভুত একটা চাপ! মাথা ঘুরে উঠেছিল···'

'এবং তারপর এক ঘুমে আটাশ ঘণ্টা পার করে দিয়েছেন। আজকের টাইমসে নয়, গতকাল আমার চিঠি পত্রিকায় পড়েছিলেন, জনাব। বুঝতে পারছেন?' আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন চ্যালেঞ্জার। 'তা বুঝবেনই বা কি করে? সবাই তো আর প্রফেসর চ্যালেঞ্জার নয়···'

পরদিন ফলাও করে দুনিয়ার সমস্ত পত্রিকায় রিপোর্ট বেরোল! চমকপ্রদ সব শিরোনাম:

আটাশ ঘণ্টা ধরে দুনিয়া সংজ্ঞাহীন!
প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের যুক্তিই ঠিক !
আবার ঘটবে নাকি ইথার বিপর্যয়?

আরও নানা রকম মজার মজার সব হেডিং।

আমাদের পত্রিকাতেও আমার লেখা একটি বিশেষ প্রবন্ধ বেরোল:

'এটা এক স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে অসংখ্য, অনন্ত, সুপ্ত শক্তি বেষ্টিত হয়ে নেহাতই সঙ্গীন অবস্থায় রয়েছি আমরা মানুষ জাতটা। সেকাল এ কালের দূরদর্শী দার্শনিকেরা বার বার এই সত্য সম্পর্কে হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন। কিন্তু তবু ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারিনি আমরা এতদিন। এবারে, এই দারুণ বিপর্যয়ে পড়েও যদি মানুষ জাতটার শিক্ষা না হয়, তো আর কোনদিনই হবে না···'

দীর্ঘ প্রবন্ধে অনেক কথাই বললাম। অগ্নিকাণ্ড, ট্রেন দুর্ঘটনা, ইথার-বিষ সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির বিরাট ফিরিস্তি সহ লিখলাম আমাদের অক্সিজেন-কক্ষ আর রোমহর্ষক মোটর অভিযানের কথা। বিস্তারিত, সব। কোন কথা বাদ না দিয়ে।

সে-রাতে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের পড়ার ঘরে সমবেত হলাম আমরা। চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম আমি, চ্যালেঞ্জার, সামারলি এবং লর্ড জন। কফি সরবরাহ করলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রফেসর, একটা কথা কিন্তু এখনও বুঝলাম না। মরে যাওয়া মানুষগুলো আবার বেঁচে উঠল কিভাবে?'

'আসলে মরেইনি ওরা,' বললেন চ্যালেঞ্জার। 'ইথারের বিষক্রিয়ায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল শুধু। মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠেছিল চেহারায়। এ ধরনের সাময়িক মৃত্যু ঘটতে পারে, মেডিক্যাল সাইন্সে আছে। এতে রোগীর টেম্পারেচার নেমে যায়, শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, নাড়ির গতি এত ক্ষীণ হয়ে যায় যে ধরাই যায় না। কয়েক ঘণ্টার জন্যে এই সাময়িক মৃত্যুই ঘটেছিল সবার। অল্প সময়ের মধ্যে বিষ বলয় থেকে পৃথিবী বেরিয়ে যাওয়াতে বেঁচে গেছে। আরও বেশি সময় থাকলে···'

কি ঘটত ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন প্রফেসার।

শীত করতে লাগল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। চাঁদ উঠেছে। আগের রাতের মত। তবে আজ আর ফ্যাকাসে লাগল না রূপালী আলোটা।

ডিসইনটিগ্রেশন মেশিন

মেজাজ একেবারেই ঠিক নেই আজ প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের। রিডিং রুমের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম তাঁর বাড়ি-কাঁপানো গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর: 'কি পেয়েছেন শুনি? দুবার বললাম রঙ নাম্বার। তারপরেও করছেন। কি ভেবেছেন আপনি? আমার মত একজন বিজ্ঞানীর গবেষণায় এ রকম বাধা আসতেই থাকবে, আর মুখ বুজে তাই সহ্য করব ভেবেছেন? কিছুতেই না! ডাকুন আপনার ম্যানেজারকে। শিক্ষা আজ দিয়েই ছাড়ব।...আপনিই ম্যানেজার? তো ম্যানেজ করা শেখেননি কেন? আপনার গোবরপোরা মাথায় যে বিষয় কস্মিনকালেও ঢুকবে না, সে-রকম একটা গবেষণা থেকে আমাকে তুলে এনে বিরক্ত করা তো শিখেছেন খুব! বুঝেছি, আপনাকে দিয়ে হবে না। ডাকুন আপনার সুপারিনটেনডেন্টকে।...নেই? না থাকুক। মরুক গিয়ে যেখানে খুশি। কিন্তু শেষবারের মত হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি আপনাকে, ফের যদি আমাকে জ্বালিয়েছেন তো সোজা আদালত দেখিয়ে ছাড়ব। জানেন, পড়শীর মুরগীর কোঁকর-কোঁ কানের ওপর অত্যাচার, এই রায় দিয়েছে আদালত? টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং যে আরও কত বেশি ভয়ানক এই সহজ কথাটা অন্তত নিশ্চয় আপনার মোটা মাথায় ঢুকবে। আর একটিবার যদি আমাকে জ্বালাতন করেছেন তো সোজা আপনার নামে মামলা ঠুকে দেব। তারপর বুঝবেন ঠেলা। দ্বিতীয়বার আর সাবধান করা হবে না, মনে থাকে যেন।'

ঠকাস করে ক্রেডলে রিসিভার আছড়ে রাখলেন চ্যালেঞ্জার।

যা থাকে কপালে, ভেবে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই বুঝলাম মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। রিসিভার রেখে ভয়ঙ্কর গতিতে ঘুরে দাঁড়ালেন চ্যালেঞ্জার। আমাকে দেখে আরও খেপে গেলেন। খাড়া হয়ে উঠল চুল। হাপরের মত ওঠানামা করতে লাগল বিশাল রোমশ বুক। কটমটে, ক্রুদ্ধ, উদ্ধত, ধূসর চোখে আমার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। প্রমাদ গুণলাম।

'শয়তানের গোষ্ঠী!' শুরু হয়ে গেল কড়িকাঠ কাঁপানো চিৎকার, 'কষ্ট করে কামাই করা টাকা ট্যাক্সের পেছনে যাচ্ছে লোকের, আর সেই টাকার কিনা এ ভাবে শ্রাদ্ধ। গাদা গাদা মাইনে নিচ্ছে ব্যাটারা, কাজের বেলায় ঠনঠন,' বুড়ো আঙুল নাড়লেন চ্যালেঞ্জার আমার দিকে করে। 'আর কি বেলাজ, বেহায়া! গালাগাল দিচ্ছি তাও হাসে! গেল আজ সকালটা! গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত আবার এসে হাজির হয়েছ তুমি। মাথামোটা বসটা পাঠিয়েছে বুঝি? ইন্টারভিউ নেয়ার মতলব? দেখো ছেলে, বন্ধুর মত একশোবার এসো এ বাড়িতে, কিচ্ছু বলব না। খাতির যত্ন করব। কিন্তু খবরের কাগজের কাজ নিয়ে এলে দূর দূর করে তাড়াব।

বোঝা গেছে?'

পাগলের মত পকেট হাতড়াচ্ছি আমি। অনেক কাগজের ভিড়ে ম্যাকারডলের চিঠিটা আর হাতে ঠেকছে না কিছুতেই।

আচমকা আরেকটা কি কথা যেন মনে পড়ে গেল চ্যালেঞ্জারের। চেহারা দেখেই বুঝলাম, আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাঁর মেজাজ। ভালুকের মত লাফাতে লাফাতে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পেপার ওয়েট চাপা দেয়া এক টুকরো খবরের কাগজের কাটিং ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এগিয়ে এলেন। আমার নাকের নিচে কাটিংটা নাড়তে নাড়তে চাপা ভয়ঙ্কর গলায় বললেন, 'রাত জেগে লিখেছ নিশ্চয়? কষ্ট করে আমার নামটা ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। তোমার চেয়ে বড় গাধা সৃষ্টি হয়েছে আজ পর্যন্ত? যা জানো না সেটা নিয়ে পণ্ডিতি! সোলেন হোফেন স্লেটসে সম্প্রতি আবিষ্কৃত সরীসৃপদের জীবাশ্ম সম্পর্কে তুমি কি জানো? প্যারাগ্রাফটার শুরু থেকেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে আমার। আহা, কি লেখা! নোবেল প্রাইজ দিয়ে দেয়া উচিত। প্রফেসর জি· ই· চ্যালেঞ্জার যিনি কিনা এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম···'

'ঠিকই তো লিখেছি! আপনি কি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নন?'

'আবার মুখে মুখে কথা!' চেঁচিয়ে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলার অবস্থা করলেন চ্যালেঞ্জার। মুখ ভেঙচে বললেন, 'ঠিকই তো লিখেছি! আমাকে খাটো করে দেখানোর স্পর্ধা কোথায় পেলে? অন্যতম বিজ্ঞানী, হুঁহ্! তা আমার সমকক্ষ আরও দুএকজন বিজ্ঞানীর নাম শুনি তো? সামারলি নিশ্চয় একজন?'

'আরে না না, কি যে বলেন,' হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, 'উনি বিজ্ঞানী হলেন কবে থেকে?'

'উনি?'

'নাহ্, শব্দচয়নে কেবলই ভুল হচ্ছে দেখছি! অন্যতম কথাটা লেখা একেবারেই উচিত হয়নি আমার! আসলেই আমি একটা গাধা, ঠিকই বলেছেন।'

মন জোগানো কথায় কাজ হলো। খাড়া চুল আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো চ্যালেঞ্জারের। কিন্তু নিঃশ্বাসের দ্রুততা কমেনি এখনও।

'মাই ডিয়ার, গায়ের জোরে সম্মান আদায় করার জন্যে এমন করছি ভেবো না,' চেঁচানো বন্ধ হয়েছে চ্যালেঞ্জারের। 'হুঁশিয়ার থাকতে হয় আমাকে। ব্যাটারা তো সারাক্ষণই আমার পেছনে লেগে আছে, যদি একটু খুঁত বের করতে পারে, দোষ পায়, কেবল এই চেষ্টা। কিন্তু পাবে কোথায়? আমি কি ওদের মত হাঁদারাম নাকি? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।'

এমন আস্তে করে বসলাম চেয়ারটায় যেন কাঁচের তৈরি, ভেঙে যাবে। রাগ পড়েছে চ্যালেঞ্জারের। কোন কারণে এখন যদি আবার রেগে যান তো তোষামোদেও কাজ হবে না। রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসবেন আমাকে।

চিঠিটা পেয়েছি। অতি সন্তর্পণে খুলতে খুলতে বললাম, 'মিস্টার ম্যাকারডলের চিঠি। পড়ব? পড়ি?'

'মিস্টার···মানে সেই ম্যাকারডল? সম্পাদক? মনে পড়েছে, খুব একটা

খারাপ না। বজ্জাতদের মধ্যে এ লোকটাই একটু ভাল।'

তেল দিতে লাগলাম, 'আপনার সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব উঁচু। ভীষণ শ্রদ্ধা। কোন কাজে আটকে গেলে, উদ্ধারের অন্য কোনও উপায় না দেখলে, আপনার শরণাপন্ন হন। এটাও তেমন একটা কাজ।'

মেজাজ একেবারে নরম হয়ে গেল চ্যালেঞ্জারের। টেবিলে কনুই রেখে, গরিলার মত হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে, দাড়িতে-ছাওয়া থুতনি সামান্য ওপরে তুলে, রোমশ ভুরুর নিচের চোখ দুটো আধবোজা করে এক বিশেষ দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

অনেক কষ্টে পেঠফাটা হাসি রোধ করে পড়তে শুরু করলাম:

মিস্টার ম্যালোন,

'এক্ষুণি রওনা হয়ে যান। শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করুন। হ্যাম্পসটেডের হোয়াইট ফ্রায়ার্স ম্যানসনে থিয়োডোর নেমর নামে একজন ল্যাটভিয়ান থাকেন। ভদ্রলোক বলে বেড়াচ্ছেন একটা অদ্ভুত মেশিন নাকি আবিষ্কার করেছেন। অসাধারণ মেশিন। রেঞ্জের ভেতর থাকলে যে কোন পদার্থকে চোখের নিমেষে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। যে কোন পদার্থকে অণু-পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট করে দিতে পারে। আবার ফিরিয়ে আনতে পারে আগের অবস্থায়।

'মেশিনটার ভয়াবহতা ভেবে দেখুন একবার। এ যুগের চেহারা পাল্টে দিতে পারে। মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। সাময়িকভাবে যে কোন যুদ্ধ জাহাজ বা সৈন্যদলকে অ্যাটম বানিয়ে রেখে দেয়া যাবে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে। যে রাষ্ট্রের হাতে থাকবে এই অস্ত্র, পৃথিবীর মালিক হয়ে যাবে তারা। আবিষ্কারটা বিক্রি করতে আগ্রহী নেমর। প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। দেখা পেতে অসুবিধে হবে না। সঙ্গে একটা কার্ড দিলাম, বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এটা দেখালেই নেমরের দেখা পাওয়া যাবে। দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, পৃথিবীর স্বার্থে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে নিয়ে দেখা করুন তাঁর সাথে। যে লোক এমন মেশিন আবিষ্কার করতে পারেন, তিনি সোজা লোক নন। তাঁকে জব্দ করতে হলে কিংবা বোঝাতে হলে শ্রদ্ধেয় প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা মনে পড়ছে না আমার। কিছু করতে পারলেন কিনা আজ রাতেই খবর চাই।'

চিঠিটা আবার ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বললাম, 'আপনাকে ছাড়া কোন উপায় নেই। প্লীজ, প্রফেসর, চলুন!'

'ঠিকই উপায় নেই। কারণ এমন মেশিনম্যানের বিরোধিতা করা যার-তার কর্ম নয়,' প্রসন্ন উদার কণ্ঠে বললেন চ্যালেঞ্জার। 'বয়েসে কাঁচা হলেও সব সময় দেখে আসছি তোমার বুদ্ধিটা বেশ পাকা। এমনিতেই তো সকালটা মাটি করে দিল টেলিফোন। ব্যাটাদের অত্যাচারে কাজটা আর শেষ করতে পারলাম না। কি কাজ জানো? ইটালির ওই যে জোচ্চোর, নাম-কা-ওয়াস্তে-বিজ্ঞানী ম্যাজোটি, কড়া করে লিখছিলাম তাকে। নিরক্ষীয় উইপোকার শুককীট বৃদ্ধি নিয়ে ওর

ভুলভাল কেচ্ছার বারোটা বাজাচ্ছিলাম, বাগড়া দিল হতচ্ছাড়া টেলিফোন। তা যাক, রাতে ঝাড়ব ভণ্ডটাকে। তা বলো এখন, তোমাকে নিয়ে কি করতে হবে?'

'আপাতত আমার সঙ্গে থিয়োডোর নেমরের ওখানে গেলেই ধন্য হব,' বললাম।

অক্টোবরের সুন্দর সকালে নেমে এলাম মাটির নিচে, সুড়ঙ্গে। চেপে বসলাম টিউব-ট্রেনে। ছুটলাম উত্তর লন্ডনের উদ্দেশে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা বাড়িতে থাকে থিয়োডোর নেমর। বেল টিপতে দরজা খুলে দিল পুরুষ সেক্রেটারি। সুসজ্জিত ড্রইংরুমে বসাল। আমার দেয়া কার্ডটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

অপেক্ষা করতে লাগলাম। আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তবু সেক্রেটারির দেখা নেই। খেপে যাচ্ছেন চ্যালেঞ্জার। শঙ্কিত হয়ে পড়ছি ক্রমেই। আরও দেরি হলে কোন্ কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন ঈশ্বরই জানেন। আড়চোখে দেখলাম, চুল খাড়া হয়ে উঠছে তাঁর। আর বোধহয় দুর্ঘটনা ঠেকানো গেল না। ঠিক এই সময় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল সেক্রেটারি। ডাকল, 'আসুন। স্যার দেখা করবেন এবার আপনাদের সাথে।'

একটা কড়া কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন চ্যালেঞ্জার।

সেক্রেটারির দেখানো পথে এগোলাম।

নেমরের অফিস রুমে ঢোকার সময় আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল একজন লোক। চকচকে টপহ্যাট মাথায়, ঘন কুঁচকানো ভেড়ার লোমে তৈরি আস্ত্রাখান কোট। সম্পন্ন, বুদ্ধিমান চেহারা দেখে অনুমান করলাম রাজকর্মচারী হবে। সম্ভবত রাশিয়ান।

আমরা ঘরে ঢুকতে পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেক্রেটারি চলে গেল। ঘরের ঠিক মাঝখানে বিশাল টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসে আছে নেমর। মোটাসোটা, ভারি শরীর। বিশাল মুখটা দেখলে মাখানো ময়দার তালের কথা মনে পড়ে। রঙও অনেকটা ওরকম। তেলতেলে চামড়া। সারা মুখে ব্রন আর মেচেতার দাগ। চোখের মণি সাদাটে, বেড়ালের চোখের মত। কাঁটা-কাঁটা খাড়া কিছু লোম রয়েছে ওপরের ঠোঁটে, নাকের নিচে। গোঁফ। ঠোঁটের কোণ থেকে লালা গড়াচ্ছে। গেরুয়া রঙের ভুরুজোড়ার ওপর থেকে আরম্ভ হয়েছে করোটি। এ রকম চওড়া কপাল জীবনে দেখিনি আমি। বিশাল মাথা। সব মিলিয়ে বীভৎস চেহারা।

'জেন্টেলমেন,' আমাদের সম্বোধন করল নেমর। 'বসুন। নেমর ডিসইনটিগ্রেটর সম্পর্কে জানতে এসেছেন নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালাম।

'ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে?'

'না। আমি গেজেট পত্রিকার রিপোর্টার। ইনি বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।'

'হ্যাঁ, সত্যি বিখ্যাত,' স্বীকার করল নেমর। 'ইউরোপের সবাই জানে। যাই

হোক, যদি মেশিনের ফর্মুলা কিনতে এসে থাকেন, তো বলতেই হবে দেরি করে ফেলেছেন। ঠিক করেছিলাম, আগে যে আসবে তার কাছেই বিক্রি করব। দেরি করে ফেলেছে ব্রিটিশ সরকার। তার দেশে তৈরি হলো যন্ত্রটা, অথচ হাত ফসকে চলে যাচ্ছে অন্যদেশে। যারা নিচ্ছে, তাদেরকে আপনাদের পছন্দ হবে না। কিন্তু কি করব। আপনারা আগে আসেননি।'

'ফর্মুলা বিক্রি? করে দিয়েছেন?'

'দিয়েছি।'

'সর্বস্বত্ব প্রথম ক্রেতার?'

'অবশ্যই।'

'ফর্মুলাটা আর কেউ জানে না?'

'আমি আবিষ্কারক। আমি যখন বলিনি, জানার প্রশ্নই ওঠে না।'

'ক্রেতা নিয়ে গেছে ফর্মুলাটা?'

'না। পুরো টাকা পরিশোধ করার পর দেয়া হবে,' দুআঙুলে চুটকি বাজিয়ে কুৎসিত হাসি হাসল নেমর। 'তারপর একাধিক যন্ত্র বানিয়ে যা খুশি করুকগে তারা, আমার বলার কিছু নেই। আমি টাকা পেলেই খুশি।'

চুপচাপ বসেছিলেন চ্যালেঞ্জার। তীব্র ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে চোখমুখ থেকে। আর চুপ থাকতে পারলেন না, 'এক্সকিউজ মি, মিস্টার নেমর। আপনার যন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। কেন যেন মনে হচ্ছে, সত্যি কথা বলছেন না। এই তো সেদিন লম্বা লম্বা কথা বলেছে এক ইটালিয়ান জোচ্চোর। অনেক দূর থেকে মাইন ফাটিয়ে দেয়ার চাবিকাঠি নাকি তার হাতের মুঠোয়। গেলাম দেখতে। পরীক্ষা করে দেখা গেল, নাম্বার ওয়ান ফটকাবাজ ব্যাটা। পুনরাবৃত্তির ইতিহাস ভূরি ভূরি আছে। আমি একজন বিজ্ঞানী, জানা আছে আপনার। শুকনো কথা বলে আমাকে গেলানো একটু মুশকিল। প্রমাণ না দেখে কোন কথা বিশ্বাস করি না আমি।'

বেড়াল- চোখের বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করল নেমর। কিন্তু বিনয়ে বিগলিত হাসিটা ধরে রাখল মুখে। ঠোঁটের কোণ থেকে আরও বেশি পরিমাণে লালা গড়াতে লাগল। বলল, 'আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। শুনেছি, আপনাকে ঠকানো যায় না। দুনিয়ার সবাই ঠকলেও আপনাকে ঠকানো অসম্ভব। বুঝতে পারছি, ঠিকই শুনেছি। ঠিক আছে, প্রমাণ দেখাব। আগে যন্ত্রটা সম্পর্কে দুচারটে কথা বলে নিই।'

'পরীক্ষামূলক মডেল বানিয়েছি এটা। আকারে ছোট। তবে শর্ট রেঞ্জে দারুণ কাজ দেয়। ইচ্ছে করলেই আপনাকে অ্যাটমে পরিণত করতে পারে এই যন্ত্র, নিমেষে আবার ফিরিয়ে আনতেও সক্ষম। কিন্তু যারা এই যন্ত্র কিনছে, তাদের অন্য রকম ইচ্ছে। দুএকজনকে অ্যাটম বানিয়ে মন ভরবে না তাদের। কোটি কোটি টাকা খরচ করবে। বানাবে বিশাল আকারের যন্ত্র। হাতের মুঠোয় পুরবে দুনিয়ার সব মানুষকে।'

'দেখতে পারি মডেলটা?' জানতে চাইলেন চ্যালেঞ্জার।

'অবশ্যই। ইচ্ছে করলে নিজের ওপর প্রয়োগ করেও দেখতে পারেন, যদি

অবশ্য তেমন সাহস থাকে আপনার।'

'বাজে কথা বলবেন না!' গর্জে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। 'ফালতু কথা শুনতে একদম অভ্যস্ত নই আমি। আমার সাহস নেই তো কি আপনার আছে?'

'আরে আরে, রাগ করছেন কেন? আমি কি তাই বলেছি নাকি? নিজের শরীরের ওপর যন্ত্রটার কার্যকারিতা যাচাই করার সুযোগ আপনাকে দেব আমি। কিন্তু আরও কয়েকটা কথা শুনে নিন।'

'জলদি শেষ করুন। আমার সময় কম।'

'বুঝতে পারছি, যন্ত্রটা দেখার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কি জিনিসে তৈরি এটা, কি উপায়ে কাজ করে, জেনে রাখা ভাল,' বিনয়ের অবতার যেন নেমর। দুহাত কচলাচ্ছে। 'লবণ কিংবা চিনি জাতীয় পদার্থ পানিতে গুলে যায়, এমনকি গুলে যাবার পর ওই পানি দেখে বোঝাও কষ্টকর, সত্যি কিছু মেশানো হয়েছে। আবার ওই পানিকে বাষ্পীভূত করে উড়িয়ে দিলে চিনি কিংবা লবণ ফিরে পাওয়া যায়...'

'এ সব বাচ্চা ছেলের বিজ্ঞান আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই,' চোখ দুটো কুঁচকে গেছে চ্যালেঞ্জারের। বুঝতে পারলাম, বিপদ আসন্ন।

'এত বাধা দিলে কি করে বলি? আগে শুনুনই না,' ডান হাতের তর্জনী নাকের ফুটোয় ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ খোঁচাল নেমর। আঙুলটা চোখের সামনে এনে কি বের করেছে দেখতে দেখতে বলল, 'লবণ আর চিনির এই বিশেষ গুণ দেখেই ভাবতে লাগলাম, মানুষের দেহকে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে কি আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব?'

'আপনার ওই আঙুল সরান। বমি করে ফেলব। অত নোংরা মানুষ জীবনে দেখিনি আমি!' খসখসে গলায় বললেন চ্যালেঞ্জার। 'এক হিসেবে আপনার যুক্তি মন্দ নয়। দেহের পরমাণুকে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে হয় তো, কিন্তু আবার ওগুলো ফেরত এনে আস্ত দেহ গঠন একেবারেই অসম্ভব। আমার অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে।'

'এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছি আমি। হাসছেন? হাসুন। কিন্তু এখুনি হাসি মিলিয়ে যাবে আপনার।'

'সেটাই দেখতে চাইছি।'

'দেখাচ্ছি। তার আগে আরও একটা কথা : জাদুবিদ্যায় 'অ্যাপোর্ট' বলে একটা শব্দ আছে। অলৌকিকভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পদার্থকে ট্রান্সফার করাকে অ্যাপোর্ট বলে। অণু-পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়ে পদার্থ ইথারের ভেতর দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায়, তারপর আবার আগের অবয়বে ফিরিয়ে আনা হয় ওগুলোকে।'

'একটা অবাস্তবকে আরেকটা অবাস্তব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, মিস্টার নেমর। অ্যাপোর্টে আমি বিশ্বাস করি না। আমার সময়ের অনেক দাম। আপনার সৃষ্টিছাড়া তত্ত্ব শোনার ধৈর্য বা আগ্রহও আমার নেই। সত্যি সত্যি বানিয়ে থাকলে যন্ত্রটা দেখান, নইলে চললাম,' ওঠার উপক্রম করলেন চ্যালেঞ্জার।

অহমিকায় ঘা লাগল থিওডোর নেমরের। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল,

'আসুন।'

ঘরের উল্টোদিকের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নেমর। চ্যালেঞ্জারের পিছু পিছু আমিও গিয়ে ঢুকলাম। একটা সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়ালাম। কয়েক ধাপ নেমে শেষ হয়ে গেছে সিঁড়ি। গোড়ায় আরেকটা দরজা। বন্ধ। বিশাল এক তালা ঝুলছে তাতে। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলল নেমর। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

পেছন পেছন আমরাও ঢুকলাম।

উজ্জ্বল আলো জ্বলছে মস্ত ঘরে। সাদা চুনকাম করা। তামার তারের জন্যে কড়িকাঠ দেখার উপায় নেই। ঝালরের মত ঝুলছে অগুনতি তার। এককোণে মোটা একটা কাটা থামের মাথায় বসানো বিশাল এক প্রিজম। চওড়ায় কাঁচটা এক ফুট, লম্বা তিন ফুট। ডানে দস্তার মঞ্চে বসানো একটা চেয়ার। চেয়ারের হেলানের সঙ্গে কি এক অজানা ধাতুর খুঁটিতে বসানো একটা ধাতব টুপি। অসংখ্য তার বেরিয়ে আছে টুপিটা থেকে। চেয়ারের পাশে একটা ছোট টেবিলে কন্ট্রোল প্যানেল। মিটারের মত একটা জিনিস, তার পাশে হাতল। শূন্যের কোঠায় ঠেকে আছে রাবার-মোড়া হাতলের চিহ্নিত দাগ।

পুরো সেটটা দেখিয়ে বলল নেমর, 'এটাই নেমর ডিসইনটিগ্রেটর। আর কদিন পরেই পৃথিবী বিখ্যাত হতে চলেছে। কাঁপিয়ে দেবে বহু সিংহাসন, পতন ঘটাবে বহু সরকারের, সারা দুনিয়ায় উল্টে যাবে শক্তির ভারসাম্য। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, আমার সম্পর্কে, আমার মেশিন সম্পর্কে অনেক অশোভন উক্তি আপনি করেছেন, সৌজন্যের ধার ধারেননি। আমার রেগে যাওয়াটা স্বাভাবিক। আপনাকে অদৃশ্য করে দিয়ে আর না-ও ফিরিয়ে আনতে পারি। এটা জানার পরও মেশিনের ক্ষমতা নিজের ওপর যাচাই করতে চান? সত্যি সাহস আছে?'

সাংঘাতিক খেপে গেলেন চ্যালেঞ্জার। চেয়ারে বসার জন্যে ছুটে গেলেন।

জাপটে ধরে কোনমতে আটকালাম। 'না, আপনি যেতে পারবেন না!' চিৎকার করে বললাম, 'আপনার জীবনের অনেক দাম। ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন। ফিরিয়ে যে আনতে পারবে ওই মেশিন, কি গ্যারান্টি আছে তার? চেয়ার দেখে তো মনে হচ্ছে ডেথচেয়ার!'

'আমি যাব। তুমি সাক্ষী রইলে। যদি না ফিরিয়ে আনতে পারে ও, তো টুঁটি টিপে ধরবে। প্রথমে কিলিয়ে ভর্তা বানাবে। তারপর কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে আদালতে।'

'কিন্তু তাতে তো আপনাকে আর ফিরে পাব না। না, আপনি যেতে পারবেন না। অপরিসীম ক্ষতি হয়ে যাবে বিজ্ঞানের। বরং আমি যাচ্ছি।'

নিজের বিপদ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই চ্যালেঞ্জারের। কিন্তু বিজ্ঞানের কথায় একটু দ্বিধায় পড়লেন। এই ফাঁকে ছুটে গেলাম আমি। সোজা গিয়ে বসে পড়লাম চেয়ারে। হাতলে চাপ দিয়ে ফেলেছে নেমর। কট্ করে ছোট্ট একটু আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে উঠল মাথাটা। পলকের জন্যে কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে গেলাম যেন। পরক্ষণে চোখের সামনে থেকে কুয়াশা কেটে গেল।

দেখলাম গর্বের হাসিতে কুৎসিত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে নেমরের।

চ্যালেঞ্জারের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'কি হলো, চালান মেশিন?' তাড়া দিলাম।

'চালানো হয়ে গেছে,' অমায়িক হাসি হাসল নেমর। 'খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে আপনার ওপর। মিনিট দুই ইথার ভ্রমণ করে আবার ফিরেছেন। এবার প্রফেসর যদি রাজি থাকেন তো তাঁকেও ঘুরিয়ে আনতে পারি।' চ্যালেঞ্জারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল নেমর।

দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েছেন প্রফেসর। তাঁকে এ ভাবে বিচলিত হতে দেখিনি কখনও। লৌহকঠিন স্নায়ু গুঁড়িয়ে গেছে যেন। কাঁপতে কাঁপতে আমার হাত ধরে বললেন, 'কি সাংঘাতিক, ম্যালোন। অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলে তুমি! যন্ত্রের ওপরের আকাশে কুয়াশার মত কি যেন ভাসছিল!'

'সত্যিই অদৃশ্য হয়েছিলাম?'

'ছিলে। সত্যি বলছি, দারুণ ভয় পেয়েছিলাম। হাত-পা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। তোমাকে ফিরে পাবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এলে শেষ পর্যন্ত! যাক···' পকেট থেকে রুমাল বের করে রোমশ কপালের ঘাম মুছলেন চ্যালেঞ্জার।

হা-হা করে অট্টহাসি হাসল নেমর। একফোঁটা লালা টপ করে পড়ল শার্টের বুকের কাছটায়। 'কি হলো, স্যার? এটুকুতেই হাল ছেড়ে দিলেন? চেয়ারে বসবেন না?'

জোর করে ভয় তাড়ালেন চ্যালেঞ্জার। আতঙ্ক-ভাবটা চোখে লেগেই রইল। কিন্তু তবু সামনে পা বাড়ালেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে আটকালাম। আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিলেন। চেয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বসে পড়লেন চেয়ারে। কন্ট্রোল প্যানেলের হাতল ৩-এর ঘরে ঠেলে দিল নেমর। অদৃশ্য হয়ে গেলেন চ্যালেঞ্জার।

ব্যাপারটা ঘটবে, জানা না থাকলে চিৎকার দিয়ে উঠতাম।

'ইন্টারেস্টিং, না?' আমার দিকে তাকিয়ে বলল নেমর। 'এ মুহূর্তে ঘরের কোনও এক জায়গায় ইথারে ভাসছে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের দেহ, পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়ে। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ওই লোকের জীবন এখন নির্ভর করছে আমার হাতে। ইচ্ছে করলে এই অবস্থায় রেখে দিতে পারি চিরকাল। পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে, আমি ছাড়া।'

'আমি আপনাকে বাধ্য করতে পারি।'

আমার কথাকে পাত্তাই দিল না নেমর। খিকখিক করে শয়তানি হাসি হাসল। জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, 'আহারে, শূন্যে মিলিয়ে গেলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। কি সাংঘাতিক! আহা, যাবার সময়ও যদি একটু ভাল ব্যবহার করে যেতেন, ফিরিয়ে আনার কথা চিন্তা করতাম। তা যাকগে, ওরকম বদমেজাজী মানুষের ফিরে না আসাই ভাল···'

'খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। একটা লোহার ডাণ্ডা দেখে তুলে নিলাম। 'জলদি আনুন। নইলে একবাড়িতে মাথা ছাতু করে দেব! ফাজলামি করার আর

জায়গা পাননি!'

'আহ্‌হা, অত চটছেন কেন?' ভয় পেল নেমর। তাড়াতাড়ি বলল, 'একটু মজা করছিলাম। আসলে কি আর আনব না, অতবড় বিজ্ঞানী, কত ক্ষতি হয়ে যাবে দুনিয়ার···সে যাকগে, মেশিনের ক্ষমতা আরও দেখাচ্ছি আপনাকে। কাগজে লেখার প্রচুর মাল পাবেন। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি চুল আর দেহের কম্পন তরঙ্গ আলাদা। ইচ্ছে করলে জ্যান্ত দেহে চুল লাগাতে পারি, ইচ্ছে করলে বাদ দিতে পারি। গরিলাটাকে লোম ছাড়া দেখতে কেমন লাগে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। এটুকু করার সুযোগ অন্তত আমাকে দিন।'

হাতলে চাপ দিতে শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন চ্যালেঞ্জার। কিন্তু এ কাকে দেখছি! রাগব না হাসব বুঝতে পারলাম না। পেটফাটা হাসি ঠেকাতে পারলাম না কিছুতে। বিশাল মাথায় একটা চুলও নেই। বেঢপ খুলিটা দেখলে অ্যালুমিনিয়মের তোবড়ানো ঘটির কথা মনে পড়ে। মসৃণ চোয়াল। দাড়ি উধাও হয়ে যাওয়ায় চওড়া চোয়ালটাকে লাগছে বুলডগের চোয়ালের মত।

কন্ট্রোল প্যানেলের হাতল ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল নেমর।

আমাদের হাসির কারণ বুঝলেন না চ্যালেঞ্জার। ফিরে আসার ধাক্কা সামলাতে পারেননি এখনও। অভ্যাস-বশে দাড়িতে হাত বুলাতে গিয়ে দেখেন নেই। চকিতে হাত দিলেন মাথায়। চুল নেই। দুই বাহুর দিকে তাকালেন একেবারে নির্লোম। বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা। ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিয়ে নেমে এলেন চেয়ার থেকে। দুহাতে নেমরের টুঁটি টিপে ধরলেন। ওই গরিলা-বাহুর শক্তি আমার জানা। শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। নির্ঘাত দম বন্ধ হয়ে মরবে নেমর।

'ওকি করছেন, প্রফেসর!' প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ওকে মেরে ফেললে জীবনে আর চুলদাড়ি ফিরে পাবেন না।'

প্রচণ্ড রেগে গেলেও মগজ ঠিকই কাজ করে চ্যালেঞ্জারের। নেমরকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। ঘরে যন্ত্রপাতির অভাব নেই। বড় একটা রেঞ্চ তুলে নিলেন হাতে। চিলের মত তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে বললেন, 'ওঠো! পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে আমার চুলদাড়ি ফেরত না পেলে একটা একটা করে হাড় ভাঙব।'

এমনিতেই ভীষণ কুৎসিত চেহারা নেমরের। তার ওপর প্রফেসরের ভয়ঙ্কর চিৎকারে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে আরও বিকৃত হয়ে গেল। ভয়ে একেবারে কেঁচো। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। দ্বিগুণ লালা গড়াচ্ছে এখন ঠোঁটের কোণ বেয়ে।

'কেমন লোক আপনি, প্রফেসর!' গলায় হাত বুলিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল নেমর। 'ঠাট্টাও বোঝেন না। মেশিনের ক্ষমতা দেখতে চেয়েছেন, দেখিয়েছি। আপনাকে শায়েস্তা করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না, বিশ্বাস করুন।'

'অত ভাল কথা শুনতে চাই না,' রেঞ্চ নাচালেন চ্যালেঞ্জার। 'আমার চুলদাড়ি!' আবার গিয়ে চেয়ারে বসলেন। আমার দিকে রেঞ্চটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও, রাখো। একটু এদিক ওদিক দেখলেই সোজা মাথায় বসিয়ে

দেবে। একটা ইবলিস কমবে পৃথিবী থেকে।'

রেঞ্চটা হাতে নিলাম। তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম নেমরের পেছনে।

'দেরি কেন?' নেমরের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন চ্যালেঞ্জার।

কাঁপা হাতে হাতল চেপে ধরল নেমর। চাপ দিতে কট্ করে আওয়াজ হলো।

মুহূর্তের জন্যে নেই হয়ে গেলেন চ্যালেঞ্জার। ভাবলাম আবার তাঁকে অদৃশ্য করে দিয়েছে নেমর। নাকি অন্য কোন ফন্দি? রেঞ্চটা দেব নাকি মাথায় বসিয়ে? আর কয়েক সেকেন্ড দেরি হলে তাই দিতাম। হঠাৎ আবার চেয়ারে দেখা গেল চ্যালেঞ্জারকে। আগের চেহারা। যথাস্থানে ফিরে এসেছে চুলদাড়ি।

দাড়ির জঙ্গল আর চুলের বোঝায় হাত বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিলেন চ্যালেঞ্জার। নেমরের দিকে তাকিয়ে মোলায়েম হাসি হাসলেন। বললেন, 'রসিকতার মাত্রা ছাড়াবেন না আমার সঙ্গে। বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবেন। যাই হোক, মেশিনটা যে কাজের, তাতে কোন সন্দেহ নেই আর। কয়েকটা প্রশ্ন করব। জবাব দেবার ইচ্ছে আছে?'

'মেশিনের শক্তির উৎস কি, এটা বাদে সব প্রশ্নেরই জবাব পাবেন।'

'ফর্মুলাটা আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না, ঠিক বলছেন?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট।'

'অ্যাসিস্ট্যান্টদের কেউ?'

'কোন অ্যাসিস্ট্যান্ট নেই আমার। একা কাজ করেছি।'

'হুঁ, চেহারাটা জঘন্য হলে কি হবে, ক্ষমতা আছে আপনার, স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আপনি ছাড়া তো এ মেশিন আর কেউ চালাতে পারবে না। কাউকে শেখাননি। এর কমার্শিয়াল প্রয়োগ হবে কেমন করে?'

'বলেছি তো এটা একটা মডেল। একই নক্সায় বড় জিনিস বানানো যাবে। বিদ্যুতের সাহায্যে এমন একটা সার্কিট তৈরি করেছি, যেটা মেশিনের মাঝে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। এই তরঙ্গের ধাক্কায় ভেঙে পরমাণুতে পরিণত হচ্ছে পদার্থ, আবার উল্টো প্রক্রিয়ায় জোড়া লাগাচ্ছে। মেশিনটায় তরঙ্গ-প্রবাহ ওপরে নিচে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহ পাশাপাশি চালানোও সম্ভব।'

'যেমন?'

'যন্ত্রটার দুটো মেরু আছে। বিপরীতধর্মী। ধরা যাক, মেরু দুটো আলাদা করে সাগরে দুটো জাহাজে তুলে দেয়া হলো। মেশিন চালু করে ওই দুটো জাহাজের মাঝে যদি তৃতীয় আরেকটা জাহাজ নিয়ে আসা হয় সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটম হয়ে মিলিয়ে যাবে ওটা। যত বড় সৈন্যদলই হোক, এই মেশিনের সাহায্যে তাদেরকে মুহূর্তে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব।'

'এই ফর্মুলা শুধু একটি রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করছেন? শুধু ওরাই এর মালিক হবে?'

'হ্যাঁ। কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। টাকাটা হাতে পেলেই ফর্মুলাটা দিয়ে দেব। যোগ্য হাতে পড়লে এ যন্ত্র কি খেল দেখাবে, আশা করি কল্পনা করতে

পারছেন? অস্ত্র ব্যবহারে যারা কোন রকম দ্বিধা করে না তাদের কাছেই বিক্রি করেছি এটা। ফলটা হবে সাংঘাতিক, তাই না!'

কুৎসিত হাসিতে চকচক করছে নেমরের চোখ। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে হাসিটা। 'কল্পনা করুন, লন্ডন শহরের দুদিকে বসানো আছে বিশাল একটা যন্ত্রের দুই মেরু। বিপুল হারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে সার্কিটটা চালু করে দেয়া হলো। এর পরের অবস্থা কল্পনা করতে পারেন?' টপ করে এক ফোঁটা লালা গড়িয়ে পড়ল মুখ থেকে। আরও পড়তে যাচ্ছিল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সেটা মুছে হাসতে হাসতে বলল, 'টেমসের উপত্যকা মসৃণ হয়ে যাবে দাড়ি শেভ করার মত। বিশাল শহরটা হয়ে যাবে ধু-ধু মরু প্রান্তর। কোথাও একটা ঘরবাড়ি, কোন প্রাণী থাকবে না! দারুণ এক দৃশ্য হবে, তাই না?'

গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। এ কি মানুষ না পিশাচ! ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত শিরশির করে নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। আশ্চর্য হলাম দেখে, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার একেবারে নির্বিকার। নেমরের কথায় যেন মজা পাচ্ছেন তিনি। মুচকি মুচকি হাসছেন। আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে হাত মেলালেন নেমরের সঙ্গে। মেশিনের পাল্লায় পড়ে পাগল হয়ে গেলেন নাকি চ্যালেঞ্জার!

'আপনাকে অভিনন্দন, প্রফেসর থিওডোর নেমর,' ভাব গদগদ গলায় বললেন তিনি। 'একটা দুর্দান্ত আবিষ্কার করেছেন আপনি! আমার মতে শেষ করে দেয়াই উচিত। এত মানুষ দুনিয়ায় বেঁচে থেকে কি করবে? যত বেশি তত ঝামেলা। কমিয়ে ফেললে আরামে বাস করা যাবে। এই মেশিন পেলে আমি নিজেই মারা শুরু করে দেব।'

তারের গোলক-ধাঁধায় কয়েক সেকেন্ড হাত বোলালেন চ্যালেঞ্জার। আপনমনে বিড়বিড় করলেন, 'এত সূক্ষ্ম যন্ত্র জীবনে দেখিনি।' হঠাৎ কি ভেবে গিয়ে উঠে বসলেন চেয়ারটায়।

খিকখিক করে হাসল নেমর। 'আবার ইথার-ভ্রমণের সখ হলো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

নেমর হাতলে হাত দিতে যেতেই বাধা দিলেন চ্যালেঞ্জার। 'এক মিনিট, প্রফেসর। মনে হয় ইলেকট্রিসিটি লীক করছে! কেমন একটা শিরশিরানি ভাব।'

থমকে গেল নেমর, 'অসম্ভব! স্পেশাল ইনসুলেটরে মোড়া প্রতিটি তার। লীক করার প্রশ্নই ওঠে না!'

'আপনি যা-ই বলেন, করছে,' তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে নেমে এলেন চ্যালেঞ্জার। 'জলদি মেরামত করুন। নইলে বিগড়ে যাবে মেশিন।'

উদ্বিগ্ন হলো নেমর। তাড়াতাড়ি চেয়ারে গিয়ে বসল। হেলানে পিঠ রেখে চাপ দিয়ে বলল, 'কই, আমি তো কিছু টের পাচ্ছি না!'

'কি বলছেন?' অবাক হয়ে নেমরের দিকে তাকালেন চ্যালেঞ্জার, 'পিঠের কাছটায় দেখুন। করছে না শিরশির?'

'নাহ্, কিচ্ছু টের পাচ্ছি না!' পেছন ফিরে তাকাল নেমর। পিঠ ফাঁক করে হেলানের মাঝখানটায় হাত বোলাল।

কট্ করে আওয়াজ হলো।

উধাও হয়ে গেল নেমর। চেয়ার খালি।

ফিরে তাকালাম চ্যালেঞ্জারের দিকে। মিটিমিটি হাসছেন।

চিৎকার করে উঠলাম, 'কন্ট্রোল প্যানেলে হাত দিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ,' শান্তকণ্ঠে বললেন চ্যালেঞ্জার, 'বোকার মত চাপও দিয়ে ফেলেছি হাতলে। অ্যাক্সিডেন্ট।' হাসিটা লেগেই আছে তাঁর মুখে।

তাকিয়ে দেখলাম, তিন নম্বর খাঁজে আটকে আছে হাতল।

আমি কি দেখছি বুঝতে পারলেন প্রফেসর। 'তোমাকে উধাও করার সময় লক্ষ করেছি ওই খাঁজে হাতল ঠেলে দিয়েছিল নেমর।'

'ফিরিয়ে এনেছে কয় নম্বরে দিয়ে?'

'ভুলে গেছি।'

'বলেন কি!' ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম, 'তাহলে ফেরাবেন কি করে ওকে?'

'ফেরানোর কি কোন দরকার আছে?' আবার হাসলেন চ্যালেঞ্জার।

'দরকার আছে মানে!...আ-আপনি...'

আমার কথার জবাব দিলেন না প্রফেসর। বিশাল এক হাতুড়ি তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। ধ্রাম করে বাড়ি মারলেন যন্ত্রের ধাতব চেয়ারটায়। থামলেন না। পিটিয়ে ভাঙতে ভাঙতে বললেন, 'এক ভয়ঙ্কর পিশাচের হাত থেকে রক্ষা পেল পৃথিবী। সকালটা শেষ পর্যন্ত ভালই কাটল। নেমরের অদৃশ্য হওয়ার রহস্যটা অমীমাংসিত থেকে যাবে।...জীবনটা বড়ই নীরস। মাঝেমধ্যে এমন টুকরো আনন্দ পাওয়া গেলে মন্দ হয় না।'

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন চ্যালেঞ্জার। 'অনেক বেলা হলো। যাওয়া দরকার। ধাপ্পাবাজ ম্যাজোটির গোষ্ঠী উদ্ধার করতে হবে। নইলে মানুষকে বোকা বানাতেই থাকবে। এ সব বাঁদরদের সুযোগ দেয়া উচিত নয় মোটেও।'

বিমূঢ়ের মত রওনা হলাম তাঁর পিছু পিছু। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকালাম। ভাঙা চেয়ারের ওপর শূন্যে ভাসছে অতি হালকা কুয়াশার মত কি যেন!

'পিশাচই বলুন আর যাই বলুন, আপনি কিন্তু মানুষ খুন করলেন...'

'না, মানুষ খুন ঠেকিয়েছি। কোটি কোটি লোকের অকালমৃত্যু বন্ধ করেছি। মানবজাতির মস্ত বড় একটা উপকারের জন্যে বরং আমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

ধরণীর চিৎকার

ম্যালোনের মুখে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু কখনও দেখিনি তাঁকে। আর তাঁর সঙ্গে কাজ করতে হবে, এটা তো স্বপ্নেও ভাবিনি কোনদিন। অপ্রত্যাশিতভাবে চিঠিটা পেয়ে তাই খুবই অবাক হলাম। লিখেছেন:

১৪, এনমোর গার্ডেন্স,
কেনসিংটন।

স্যার,

কূপ খননে একজন বিশেষজ্ঞ দরকার আমার। সত্যি কথাটা স্বীকার করছি, বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে আমার ধারণা ভাল নয়। কাউকেই কোন ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারি না। কোন কাজে জ্ঞান আহরণ করতে হলে মগজ থাকা চাই। ব্যাপারটা আরও খোলাসা করে বলি। নিজের মস্তিষ্কের ক্ষমতা এতই বেশি আমার যে, কম ক্ষমতাবান মানুষের ওপর আর ভরসা করতে পারি না।

যাই হোক, আপনার সম্পর্কে মোটামুটি ভাল ধারণা পেয়েছি আপনার বন্ধু ম্যালোনের কাছে। আপনাকে আমার একটা কাজ করার সুযোগ দিতে চাই। সুতরাং আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন। আমার কাজের ধরনটা খুবই উঁচুদরের। যদি বুঝি কাজের লোক আপনি, তাহলে কাজটা পাবেন।

কি কাজ, চিঠিতে বলা যাবে না। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। আগামী শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় আমার সঙ্গে দেখা করুন। অন্য কোথাও কোন প্রোগ্রাম থাকলে এখুনি বাতিল করুন। লাঞ্চটা আমার এখানে সারবেন সেদিন। মিসেস চ্যালেঞ্জার কাউকে না খাইয়ে ছাড়েন না।

জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার

ক্লার্ককে ডেকে চিঠির জবাব দিতে বলে দিলাম। সামান্য ভুল করে বসল ক্লার্ক। লিখল, 'স্যার, আপনার তারিখবিহীন চিঠিটা পেয়েছি। নির্দিষ্ট দিনে মিস্টার পিয়ারলেস জোনস আপনার ওখানে হাজির হবেন...'

ওই 'তারিখবিহীন' শব্দটাই ধরে বসলেন চ্যালেঞ্জার। শুক্রবারের আগেই তাঁর আরেকটা চিঠি এসে হাজির। লিখেছেন:

'চিঠিতে তারিখ না দেয়ার তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে আপনি মন্তব্য করেছেন! বুঝতে পারছি, ঘটে ঘিলুর কিছুটা অভাব আছে আপনার। নইলে অতি সহজেই তারিখটা জেনে নিতে পারতেন।

'আমার তারিখ দেবার দরকারটা কি? প্রচুর পয়সা দিয়ে ডাকটিকেট কিনতে হয়। তার বিনিময়ে চিঠি ডেলিভারি দেবার আগে খামের ওপর একটা গোল সিল মারে সরকারের লোক। তারিখ যদি এতই প্রয়োজন, ওখান থেকে বের করে নিতে পারতেন। আর যদি সিল অস্পষ্ট হয়ে থাকে, তারিখ বোঝা না যায়, তো সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট অফিসে খোঁজ নেয়া উচিত ছিল। ওব্যাটারা আমাদের কষ্টে উপার্জিত টাকায় দেয়া ট্যাক্স থেকে বেতন নিয়ে থাকে। ঠিকমত কাজ করবে না কেন?

'যা হোক, আপনাকে যে ব্যাপারে ডাকা হয়েছে কথা বলবেন শুধু সেই ব্যাপারে। আমার চিঠি সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।'

বদ্ধ উন্মাদের পাল্লায় পড়লাম মনে হলো। তাঁর কাজে নিজেকে জড়ানোর আগে ম্যালোনের সঙ্গে একটু আলাপ করে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম। নইলে শেষে কোন বিপদে গিয়ে পড়ি কে জানে!

শুনে তো হেসে গড়িয়ে পড়ল ম্যালোন। 'এই ব্যাপার। চিঠিতে গালাগাল করেছে তো শুধু। বাড়ি এসে যে ধরে পেটায়নি, বেঁচেছিস। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চ্যালেঞ্জারের জুড়ি নেই।'

'কেউ কিছু বলে না?'

'বলে না মানে? তাঁর বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমার লিস্ট দেখলে মাথা ঘুরে যাবে তোর। লোকে দুচোখে দেখতে পারে না তাঁকে। বেশির ভাগ মারামারির মামলা। মামলা করতে চ্যালেঞ্জারেরও জুড়ি নেই। কে কোন্ পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে একটা সমালোচনা করে কথা বলল কি দেবে মামলা ঠুকে।'

'মানুষকে সত্যি মারে?'

'তো আর বললাম কি এতক্ষণ? ভাবিসনে তোকে ছেড়ে দেবে। কাউকে ছাড়ে না। কথা বলতে খুব সাবধান! খেপে গেলে আর রক্ষা নেই। আমাকেও রেহাই দেয়নি! ভদ্র পোশাক পরা এক আধুনিক গুহামানব। জন্মটা একটু দেরিতে হয়ে গেছে, এই যা। নিওলিথিক বা কাছাকাছি কোন যুগের অতিবুদ্ধিমান বর্বর বলা চলে তাঁকে।'

'বর্বরের অমন ব্রেন···'

'সত্যি আশ্চর্য! ইউরোপে, বলতে গেলে পৃথিবীতেই এ যুগে এমন ব্রেন আরেকটা আছে কিনা সন্দেহ। ওই ব্রেনের কাছে কোন স্বপ্নই স্বপ্ন নয়। অবাস্তবকে বাস্তব করে তোলে। একবার যদি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তো তাঁকে ঠেকানোর সাধ্য কারও নেই।'

'নাহ্, থাক, বাদই দিই। এ লোকের সঙ্গে কাজ করা যাবে না বুঝতে পারছি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দেব।'

'সেটা তোর ইচ্ছে। তবে যদি মানিয়ে নিতে পারিস···দেখবি তাঁর মত ভাল লোক পৃথিবীতে নেই।'

'একসঙ্গে একজন মানুষ খারাপ এবং ভাল হয় কি করে?'

'সেটা চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে পরিচিত হলেই বুঝবি। আসলে চ্যালেঞ্জারকে ভয় করার তেমন কোন কারণ নেই, বিশেষ করে তুই যখন খবরের কাগজে কাজ করিস না। স্বভাবটা পাগলাটে, কিন্তু মনটা বড় নরম। লোকের বিপদে নিজের জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। গুটি বসন্তে আক্রান্ত এক ইন্ডিয়ান শিশুকে কোলে করে একবার ভয়ঙ্কর মদিরা নদীর ধার দিয়ে একশো মাইল পথ হেঁটে এসেছিলেন। যদি তাঁর মন জয় করতে পারিস, আখেরে কাজ দেবে। ত্যাড়ামি করলেই মরবি। মেরে হাড় গুঁড়ো করবে।'

'থাক, ভাল হওয়ারও দরকার নেই, মার খাবারও দরকার নেই। যাবই না।'

'পস্তাবি কিন্তু তাহলে। হেংগিস্ট ডাউন রহস্য সম্পর্কে কিছু শুনেছিস? ওই যে দক্ষিণ উপকূলে মাটির গভীরে লোহার পাইপ পোঁতা হচ্ছে?'

'শুনেছি। গোপনে কয়লাখনি আবিষ্কারের কাজ চলছে।'

'ওসব গুজব। আসল কথাটা কচুও জানিস না। বুড়োর সব খবর রাখি আমি. আমাকে সবই বলেন। তাঁকে কথা দিয়েছি, কাউকে বলব না। তাই তোকেও বলা যাবে না। যদি যাস, চ্যালেঞ্জারই তোকে বলবে সব। এমনিতেই তিনি মস্ত ধনী।

তার ওপর অনেক বিজ্ঞান-পাগল মানুষ বিজ্ঞান-সাধনার জন্যে প্রচুর দান করে। এই তো সেদিন এক ভদ্রলোক মিস্টার বেটারটন, বিশাল সম্পত্তি দান করেছেন চ্যালেঞ্জারকে। ভদ্রলোক রবার ব্যবসায়ী। সম্পত্তিটার দাম এই বাজারে কয়েক কোটি পাউন্ডের কম না। ওটা বিক্রি করে দিয়েছেন চ্যালেঞ্জার। সাসেক্সের হেংগিস্ট ডাউনে বিশাল এক পতিত জমি কিনেছেন। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছেন। জমির মাঝামাঝি একটা গভীর খাদ আছে। বৃষ্টির পানিতে খড়িমাটি ধুয়ে চলে গিয়ে এই খাদের সৃষ্টি হয়েছে। ওখানে মাটি খোঁড়া শুরু করেছেন তিনি। বাইরের কোন লোককে ধারেকাছে ঘেঁষতে দেন না। শ্রমিকদের মোটা মাইনে দেন। অনেক টাকা বেতনে পাহারাদার রেখেছেন। ফলে কেউ ভেতরের কথা ফাঁস করে না।'

আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসল ম্যালোন, 'মাঝের ওই খাদ ঘিরে দেয়া হয়েছে ডবল তারের বেড়া। তারওপর ডজনখানেক ভয়ঙ্কর ব্লাডহাউন্ড ছেড়ে দেয়া হয়েছে ভেতরে। চুরি করে ঢোকার সাধ্য নেই কারও বাপেরও। প্রচণ্ড কৌতূহলে ফেটে মরছে পত্রিকাওয়ালারা। রাতের বেলা কাঁটাতারের প্রথম বেড়াটা ডিঙিয়েছিল দুএকজন রিপোর্টার কিন্তু খাদের মধ্যে আর ঢুকতে পারেনি। কুকুরের তাড়া খেয়ে কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছে। বিশাল কাজে হাত দিয়েছেন এবার চ্যালেঞ্জার। কাজের দায়িত্ব নিয়েছে স্যার টমাস মর্ডেন কোম্পানি। তারাও মুখ খুলছে না। কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন চ্যালেঞ্জার। মোটা টাকা পাবি কাজটা করলে। করবি না কেন?'

করব না, ম্যালোনকে বলে দিলেও শেষ পর্যন্ত কৌতূহল দাবিয়ে রাখতে পারলাম না। শুক্রবার সকালে রওনা দিলাম চ্যালেঞ্জারের বাড়ির উদ্দেশে। সময়ের ব্যাপারে হুঁশিয়ার ছিলাম, তাই দেরি তো হলোই না বরং নির্দিষ্ট সময়ের বিশ মিনিট আগে পৌঁছুলাম। গেটের কাছে আনকোরা নতুন একটা রোলস রয়েস দাঁড়িয়ে আছে। দরজায় রূপার তীর আঁকা। গাড়িটা আমার চেনা। মালিক জ্যাক ডেভনশায়ার। মর্ডেন কোম্পানির ছোট সাহেব।

গেটের ভেতর ঢুকব কিনা ভাবছি, এমন সময় ভেতর থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এলেন ডেভনশায়ার। তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, 'হারামখোর বুড়ো। জাহান্নামে যাক···'

'কাকে গালাগাল করছেন, মিস্টার ডেভন? সকাল বেলায়ই মেজাজ খারাপ?'

'আরে, মিস্টার পিয়ারলেস জোনস? আপনি এখানে?'

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ডেকেছেন। একটা কাজ দিতে চান।'

'চলে যান। ওই ভালুকটার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন না।'

'কেন?'

'কেন? অত বদমেজাজী আর খেয়ালি লোক ভাই আমি জীবনে দেখিনি! এসেছিলাম কাজের বিল নিতে। বেয়াল্লিশ হাজার পাউন্ড পাব। ও বেটা বুড়ো ভালুক চাকর দিয়ে বলে পাঠাল, এখন হবে না, অন্য সময় আসতে। বুড়ো এখন ব্যস্ত। কি করছে জানেন? একটা ডিম খাচ্ছে! আমি কি রাস্তার লোক? আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার···'

শিস্ দিয়ে উঠলাম। 'তারমানে টাকা পাচ্ছেন না?'

'পাব। পাই পাই হিসেব করে দিয়ে দেবে চ্যালেঞ্জার। একটি পয়সাও মারবে না। কিন্তু দেবে নিজের মর্জিমত। ওর ডিম খাওয়ায় কেন ব্যাঘাত ঘটালাম, সেটাই হলো রাগ। বুঝুন, এ রকম একটা সাধারণ ব্যাপারে রাগে কেউ? একেবারেই অসভ্য। ভদ্রতার ছিটেফোঁটাও নেই ওর মধ্যে।' আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন ডেভনশায়ার, 'কি কাজ করতে এসেছেন?'

'জানি না। দেখা করলে বলবেন বলেছেন।'

'ও জানেনই না এখনও! ভাল, ভাল। যান, যান। মস্ত এক অভিজ্ঞতা হবে। গুহামানব দেখেননি তো কখনও, দেখার চান্সটা ছাড়া উচিত হবে না। কথাবার্তা বুঝেশুনে বলবেন। নইলে কপালে দুঃখ আছে আপনার।'

গাড়িতে গিয়ে উঠলেন ডেভনশায়ার।

স্টার্ট নিয়ে চলে গেল রোলস রয়েস।

গেটের কাছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছি, আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি। ঠিক সময় না হলে ভেতরে ঢুকব না কিছুতে। শুরুতেই প্রফেসরের কোপদৃষ্টিতে পড়তে চাই না। ঈশ্বরই জানেন, কোন্ ফ্যাসাদে পড়তে যাচ্ছি!

খেলাধুলার অভ্যাস আছে আমার। শক্ত-সমর্থ শরীর। ভয়ডর তেমন নেই প্রাণে। কিন্তু প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবতেই কেন যেন বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যাচ্ছে। ভয়ে না উত্তেজনায় ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মারামারি করতে এলে ঠেকাতে পারব। কিন্তু অকারণে যদি অপমান করে বসেন? সহ্য করতে পারব না। হয়তো ছেড়ে কথা বলব না। কি যে ঘটবে তখন, এটা ভেবেই অস্বস্তিটা হচ্ছে বেশি।

কিন্তু চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করার প্রচণ্ড কৌতূহল ঠেকাতে পারলাম না। কপালে যা থাকে, ভেবে ঠিক সাড়ে দশটায় ড্রইংরুমের দরজায় ধাক্কা দিলাম। চাকর দরজা খুলে দিল। পাথর-কুঁদা চেহারা ওর। ভাবলেশহীন। অনেক পোড় খেয়ে নির্বিকার। গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

ভড়কে গেলাম। চাকরের ভাবসাবই যদি এই হয় তো মনিবের কেমন হবে! একবার ভাবলাম ফিরে যাই। কৌতূহলেরই জয় হলো আবারও। জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ।'

পকেট থেকে ছোট ডায়রী বের করে পাতা ওল্টাল চাকর। জিজ্ঞেস করল, 'স্যারের নামটা?'

'পিয়ারলেস জোনস।'

'ঠিকই আছে। সাড়ে দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আসুন।'

চাকরের পেছন পেছন এগোলাম।

লোকটা বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার জোনস, এই কড়াকড়ির দরকার আছে। বড় উৎপাত করে খবরের কাগজওয়ালারা। তাই হুঁশিয়ার থাকতে হয়। প্রফেসর সাহেব একদম দেখতে পারেন না ওদের।'

ম্যালোন লেখক মানুষ। নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারে। কিন্তু আমার কাজ যন্ত্রপাতি নিয়ে। কলমের জোর নেই। তবু বলতে যখন বসেছি, কিছুটা বোঝানোর

চেষ্টা তো করতেই হবে। বিশাল মেহগনি কাঠে তৈরি টেবিলের ওপারে বসা মানুষটাকে মানুষ মনে হলো না আমার, কোটপ্যান্ট পরা এক গরিলা বসে আছে চেয়ারে। গালভরা দাড়ির জঙ্গল। রোমশ ভুরুর নিচে আধবোজা চোখ। মণিদুটো ধূসর, অস্বাভাবিক উদ্ধত। নিতান্ত অবহেলায় তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। যেন আমি একটা নর্দমার কীট।

পকেট থেকে কার্ড বের করে টেবিলের ওপর রেখে ঠেলে দিলাম।

তাকালেনও না চ্যালেঞ্জার। খসখসে গম্ভীর গলায় বললেন, 'দলিল-দস্তাবেজ দেখাতে হবে না। আপনি যে পিয়ারলেস জোনস না বলে দিলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না। চেহারাখানা কি, আহা! নামটাও তেমনি। শুনলে হাসি পায়!'

মেজাজ খিঁচড়ে গেল। রাগ দেখিয়ে বললাম, 'আমার চেহারা কিংবা নামের সমালোচনা শুনতে আসিনি। কাজটা কি তাই বলুন।'

'গুড, গুড। মেজাজ আছে! গায়ে ফোস্কা পড়ল নাকি? দুর্বল স্নায়ুর লক্ষণ, একটুতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়া। সাবধানে কথা বলা দরকার। সিনাই পেনিনসুলায় খনন কাজের ওপরে লেখাটা পড়েছি। আপনিই লিখেছেন তো?'

'আমার নামেই বেরিয়েছে,' রাগটা না কমায় ঘুরিয়ে জবাব দিলাম।

'আপনার নামে বেরোলেই যে আপনি লিখেছেন, সেটা প্রমাণ হয় না। কত লোকে আরেকজনের লেখা নিজের নামে ছেপে দিয়ে বসে থাকে। সেটার যখন কেউ প্রশংসা করে আবার আত্মতৃপ্তিও পায়। সে যাকগে, বসুন। পচা লেখা আপনারটা। বড়ই একঘেয়ে। তবে আইডিয়াটা নতুন, সেজন্যে পড়তে পেরেছি। নতুন চিন্তার খোরাক আছে। বিয়ে-শাদী করেছেন?'

'না।'

'গুড। পেটে কথা রাখতে পারবেন তাহলে।'

'কথা দিলে সেটা রাখতে হয়, এটাই শিখিয়েছেন পূর্বপুরুষেরা।'

'যাক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। যত বাজে নামই রাখুক, পূর্বপুরুষদের দূরদৃষ্টি আছে। ম্যালোন ছেলেটা অবশ্য,' এমনভাবে বললেন যেন 'ছেলেটার' বয়েস মাত্র দশ বছর, 'আপনার সুখ্যাতি করেছে খুব। আপনাকে নাকি বিশ্বাস করা যায়। বিশ্বাসই হলো সব কাজের মূলধন। পৃথিবীর বড় বড় এক্সপেরিমেন্টের মত এটাও···না না, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এক্সপেরিমেন্ট এটা···কাজেই মুখে তালা আঁটতে হবে। আমার সম্পর্কে নিশ্চয় অনেক আজেবাজে কথা শুনেছেন। সত্যি কাজ করতে চান তো?'

'করতে পারলে সৌভাগ্যই মনে করব।'

আমার এ কথাটায় খুশি হলেন মনে হলো প্রফেসর। 'তা-তো নিশ্চয়। এ সৌভাগ্যের ভাগ অবশ্য কাউকেই দেয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কি করব, একা কুলিয়ে উঠতে পারছি না। যাকগে, পেটে কথা রাখবেন বলে কথা দিয়েছেন যখন, পূর্বপুরুষেরও দোহাই দিলেন, বিশ্বাস করলাম। যা বলব, মন দিয়ে শুনবেন। তর্ক করবেন কম। তর্ক আমি একদম সইতে পারি না।' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু বোঝার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ ছুঁড়ে দিলেন প্রশ্নটা, 'বলুন তো আমাদের এই পৃথিবীটা জ্যান্ত, না মরা?'

'অ্যাঁ!' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসবেন চ্যালেঞ্জার, কল্পনাও করিনি। শুনেছি উল্টো কাজ করতে জুড়ি নেই প্রফেসরের, উল্টো জবাবই দিলাম। 'জ্যান্ত।'

'ভেরি গুড!' খুশি হলেন চ্যালেঞ্জার। 'অল্পবিস্তর ঘিলু তাহলে আছে মাথায়। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, জ্যান্ত। জ্যান্ত প্রাণী। শ্বাস নেয়ার যন্ত্র আছে পৃথিবীর, রক্তবাহী শিরা-উপশিরা-ধমনী সবই আছে। এমনকি স্নায়ুমণ্ডলীও আছে।'

এ যে দেখছি বদ্ধ উন্মাদ! হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম বোকার মত।

'আমার তত্ত্বটা মাথায় ঢুকল না, বুঝতে পারছি,' মৃদু হাসলেন প্রফেসর। 'ঢুকবে, আস্তে আস্তে। রোমশ জন্তুর শরীরের সঙ্গে পৃথিবীর বাদাভূমির অনেক মিল। এ রকম অনেক মিল আছে নানা রকম প্রাণীর সঙ্গে। ভূমিকম্পটা হলো গা চুলকানো কিংবা আঙুল মটকানো।'

'আগ্নেয়গিরির ব্যাপারটা তাহলে কি?'

'ওটা খোঁজার জন্যে আর দূরে যাওয়া লাগে না। ওরকম তেতে থাকা জায়গা আমাদের দেহের মধ্যেই আছে।'

এ যে দেখছি ভয়ঙ্কর উন্মাদ। সময় থাকতে কেটে পড়ার কথা ভাবতে ভাবতে মুখ ফসকে বলে ফেললাম, 'তাহলে বডি-টেম্পারেচারের ব্যাপারটা কি বলুন তো? কূয়া খুঁড়তে গিয়ে লক্ষ করেছি, পাতালে যত নেমে যাওয়া যায়, তাপমাত্রা তত বাড়ে। যেন পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলটা টগবগ করে ফুটছে।'

হাত দিয়ে একটা নিরাশ ভঙ্গি করলেন চ্যালেঞ্জার। বললেন, 'বাচ্চা ছেলেদের ভূগোল বইতে লেখা থাকে পৃথিবীর দুই মেরু কমলালেবুর মত সামান্য চাপা। তারমানে দুই মেরু কেন্দ্রের একটু বেশি কাছাকাছি। তাহলে কেন্দ্রের উত্তাপ তো দুই মেরুতে বেশি হবার কথা। তার বদলে ওখানে বরফ কেন?'

'ভাবিনি তো!'

'তা ভাববেন কেন? মৌলিক চিন্তায় অনেক ঝক্কি আছে। সাধারণ মানুষ এ সব ব্যাপার বুঝতে চায় না, ভাবতেও চায় না। আচ্ছা, একটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাকে,' ড্রয়ার থেকে বের করে দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর, 'এটা কি জানেন?'

'কাঁটাওয়ালা এক জাতের সামুদ্রিক জন্তু।'

'সামান্য ভুল হয়ে গেল। সামুদ্রিক ঠিকই, তবে কাঁটাওয়ালা নয়,' এমন ভঙ্গিতে বললেন প্রফেসর, যেন আমি একটা দুধের শিশু। 'খোলসে ছুচঁলো এবং ভোঁতা এই যে টিলাটক্করগুলো দেখছেন, এগুলো কাঁটা নয়। প্রাণীটার নাম জানেন না বোঝা যাচ্ছে, তাহলে নামটাই বলতেন, সামুদ্রিক প্রাণী বলতেন না। এর নাম ইকিনাস। পৃথিবীর একটা খুদে মডেল বলতে পারেন। ভাল করে দেখুন, এর দুই মেরু সামান্য চাপা, আকারেও মোটামুটি গোল। টিলাটক্করগুলোকে পৃথিবীর পাহাড়-পবর্ত বললে নিশ্চয় ভুল হবে না। মানতে আপত্তি আছে?'

আছে তো অবশ্যই, বললাম না সেকথা। পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর, নিছক পাগলামি! ভিত্তিহীন সব যুক্তি দিয়ে চলেছেন প্রফেসর। মুখের ওপর বলার সাহস পেলাম না। আমি যত শক্তিশালীই হই, মারপিট বাধালে ওই গরিলার সঙ্গে পারব

না বুঝে গেছি। নিরীহভাবে যতটা সম্ভব ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু প্রাণী হলে তার খাবার দরকার। পৃথিবী কি খায়? খাবারটা আসে কোত্থেকে?'

'ভেরি গুড! বুদ্ধি আছে ঘটে,' দারুণ এক হাসি দিলেন চ্যালেঞ্জার। আমার মনে হলো ওটা হাসি নয়, যুদ্ধংদেহী গরিলার বিকট মুখব্যাদান! 'চট করে আসল পয়েন্টে চলে আসতে পারছেন। তবে সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো বুঝতে পারেন না। তাতে অবশ্য দোষ দিই না। সামারলির মত লোকই পারত না···ও, আপনি তো আবার আরশোলাটাকে চেনেন না···'

'না না, চিনি, মানে নাম শুনেছি।'

'শুনে কিছু বোঝা যায় না। এই যে আমি, আমার নামও তো শুনেছেন। কিন্তু শোনা লোকের সঙ্গে আমার কোন মিল আছে কি?'

মিল নেই স্বীকার করলাম, কিন্তু মনে মনে। শুনেছি আধপাগল। এখন দেখি পুরো পাগল। জবাব দিলাম না।

দুই সেকেন্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রফেসর বললেন, 'আপনার মুখের ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে আমার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা। তা থাকগে···যা বলছিলাম···আপনার প্রশ্ন, পৃথিবীর খাবার আসে কোত্থেকে? কি খেয়ে বাঁচে পৃথিবী? এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে দেখা যাক, ইকিনাসরা কি খেয়ে বাঁচে! এরা জলচর। গায়ের টিলাটক্করগুলোতে অসংখ্য খুদে ছিদ্র আছে। এই সব ছিদ্র দিয়ে পানি ঢোকে শরীরে। এটাই এদের খাদ্য···'

'তারমানে পানি খেয়ে বাঁচে পৃথিবী, বলতে চাইছেন?'

'না। পৃথিবীর পুষ্টি যোগায় ইথার। পুরো মহাশূন্যটায় ছড়িয়ে আছে এই ইথার। ছুটতে ছুটতে পুষ্টি শুষে নিচ্ছে পৃথিবী। ঠিক একই ভাবে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহরাও ইথার খেয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে। এখন বুঝতে পারছেন, ইকিনাসের সঙ্গে মিলটা কোনখানে?'

চুপ করে রইলাম।

ভাবলেন, আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। অনুকম্পার হাসি হাসলেন। যেন জীবন ধন্য করে দিলেন আমার। বললেন, 'মনে ধাঁধা একটু এখনও আছে আপনার, খানিক পরে সেটুকুও থাকবে না। ইকিনাসকে মডেল কল্পনা করে ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন, বুঝে যাবেন।'

চুপ করে রইলাম। পাগলের প্রলাপ তর্ক না করে শোনার প্রস্তুতি নিলাম।

'ইকিনাসের গা কেমন শক্ত দেখেছেন? এর শক্ত খোলার ওপরে বেশ কিছু খুদে পোকা যদি ছেড়ে দিই, টের পাবে কিছু? আই মীন, জ্যান্ত অবস্থায় কিছু টের পেত কি?

'মনে হয় না।'

'মনে হয় না আবার কি? আমি বলছি, পেত না।'

'ঠিক আছে পেত না। কি হলো তাতে?'

'ভাঙা জাহাজ বহুদিন সাগরে থাকলে যেমন তার গায়ে শেওলা পড়ে, জলজ কীট বাসা বাঁধে, তেমনি পৃথিবীর গায়েও শেওলা পড়েছে, কীটেরা বাসা বেঁধেছে। জিজ্ঞেস করতে পারেন, জাহাজ থাকে পানির নিচে, পৃথিবী থাকে কোথায়? ওই যে

আগেই বললাম, ইথার। ইথার হলো গ্রহদের মহাসমুদ্র। পৃথিবীরও তাই। এর গায়ের বিশাল বিশাল বনগুলো হলো শেওলা। আর কীট, অর্থাৎ প্রাণী যে কত আছে সেটা অনুমান না করতে পারার মত বোকা অন্তত আপনি নন। যাই হোক, এই যে আমরা, মানে সব প্রাণীকূল মিলে পৃথিবীর গায়ে জীবাণুর মত কিলবিল করছি, পৃথিবী কি টের পাচ্ছে?'

জবাব দিলাম না। কি দেব?

'পাচ্ছে না,' প্রফেসর বললেন। 'পাত্তাই দিচ্ছে না আমাদের। হঠাৎ একদিন ভাবতে গিয়ে মনে হলো, পৃথিবীর সঙ্গে একটু রসিকতা করা যাক। একটা খোঁচা দিয়ে দেখব কি করে।'

মাথা একেবারেই গেছে প্রফেসরের। তর্ক করারও কোন মানে হয় না।

'তাকে জানিয়ে দেব,' প্রফেসর বলছেন, 'আমরা আছি। অত ফেলনা নই আমরা। উপেক্ষার বস্তু নই। একজন লোক অন্তত আছে খোলের ওপর, যে ইচ্ছে করলে খুঁচিয়ে শান্তি নষ্ট করে দিতে পারে তার। এমন খোঁচা মারব, হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়ব; পৃথিবীকে বুঝতে বাধ্য করব, যে-সে লোক নয় প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।'

'মাথা ঘুরছে আমার, প্রফেসর!'

'বুঝতে পারছেন না বলে ঘুরছে। অথচ কাজটা কিন্তু খুবই সহজ। আবার ইকিনাসের কথায় ফিরে আসা যাক। বাইরে শক্ত খোলা, কিন্তু ভেতরে নরম সংবেদনশীল মাংস আর দেহযন্ত্র। হয়তো খোলার ওপরে বাসা বেঁধে থাকা কোন প্রাণী ঠিক করল, ইকিনাসের টনক নড়াতে হবে। কি করবে সে? ভেতরের নরম জায়গায় আঘাত হানবে। কি করে? খোলা ফুটো করে খোঁচানোটাই সহজ। নয় কি?'

'ঈশ্বরই জানে!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম আমি।

'আমিও জানি। মশা কামড়ানোর কথাই ধরুন না। আমাদের চামড়ায় বসে হুল দিয়ে ছিদ্র করে মশা। হুলটা রক্তের সংস্পর্শে আসার পর কামড়টা টের পাই আমরা। অনুভূতিটা আসে যন্ত্রণার মাধ্যমে। আমি কি করতে চাই নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন এখন? অন্ধকারে আলো দেখা যাচ্ছে?'

'পৃথিবীর খোলা ফুটো করে ভেতরে শলা ঢোকানোর বুদ্ধি করেছেন, তাই তো?'

পরম আনন্দে চোখ মুদলেন প্রফেসর। চোখ খুলে হাসলেন। 'ধরে ফেলেছেন, যাক।'

'ফুটোটা কি আমাকেই করতে হবে?'

'না। সেটা আমি আগেই করে ফেলেছি। অনেক এগিয়ে আছে কাজ।'

'কারা করল?'

'মর্ডেন কোম্পানি। এ জন্যে রাশি রাশি বারুদ, শাবল, গাঁইতি, কোদাল, বিরাটাকৃতির তুরপুন কাজে লাগাতে হয়েছে ওদের। দিনরাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে।'

'ভূ-ত্বকে ফুটো করে দিয়েছেন? সত্যি?'

'ভড়কে গেছেন, বুঝতে পারছি। নাকি আমার কথা অবিশ্বাস করছেন?'

'না না, তা করছি না···'

'তাহলে যা বলছি, শুনুন। পৃথিবীর চামড়া ফুটো করার কাজ শেষ। চোদ্দ হাজার চারশো বেয়াল্লিশ গজ পুরু ত্বক ফুটো করতে কি পরিমাণ পরিশ্রম হয়েছে নিশ্চয় ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না আপনাকে। বাড়তি একটা লাভ হয়েছে তাতে। বিশাল এক কয়লার খনির সন্ধান পেয়েছি। এক্সপেরিমেন্টের পুরো খরচাই উঠে আসবে ওই খনি থেকে। সাংঘাতিক বেগ পেতে হয়েছে খড়িস্তরে পানির ঝর্না আর হেংগিস্ট-বালি নিয়ে। তবে ওসব পেরিয়ে গেছি।'

'কাজ তো যা করার করেই ফেলেছেন। আমি আর কি করব?'

'মশা হবেন।'

সত্যি ঘাবড়ে গেলাম এবার। 'মশা!'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন চ্যালেঞ্জার, 'অনেক কঠিন কথা বুঝে ফেলেন, সহজগুলো পারেন না। মগজের দুর্বলতাই এর কারণ। শুনুন, মশা যে কাজ করে, সেই কাজ করতে হবে আপনাকে। হুল ফোটাবেন পৃথিবীর ত্বকে।'

হাঁপ ছাড়লাম। যাক, মানুষই থাকছি। নিজের আবিষ্কৃত কোন যন্ত্র দিয়ে ল্যাবরেটরিতে আমাকে মশা বানিয়ে ফেলছেন না প্রফেসর। 'হুল পাব কোথায়?'

'হুলের কি আর অভাব নাকি? শলা ঢোকাবেন। ধাতব ডাণ্ডা। আট মাইল লম্বা।'

'মাথা খারাপ! পাঁচ হাজার ফুটের বেশি ঢোকানোই কঠিন। আমি অবশ্য ছ'হাজার দুশো ফুট পর্যন্ত নামিয়েছি। এর বেশি সম্ভব না।'

'সবটা না শুনেই মন্তব্য করেন কেন?' ধমকে উঠলেন প্রফেসর। 'আপনি পারেননি বলে যে কেউই পারবে না, এটা ভাবা বোকামি। আপনার ব্রেন আর আমার ব্রেন এক নয়। আমার মগজের জোর আপনার চেয়ে বহুগুণ বেশি। কূয়া খোঁড়ার শেষ সীমা কতটা, জানা আছে আমার। না বুঝে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড বোকার মত খরচ করছি না। যা বলব, তাই করবেন। কথা বলবেন কম। আপনার মোটা মাথাটা ঘামাবার কোন প্রয়োজন দেখছি না। একশো ফুট লম্বা ধারাল ড্রিল রেডি করুনগে! ইলেকট্রিক মোটরে চালানো হবে ড্রিলটা।'

'ইলেকট্রিক মোটর কেন?'

'সময় হলে সেটা জানতে পারবেন। অত লম্বা ড্রিল আপনার জানামত আছে কিনা সেটা বলুন।'

'আছে।'

'কাজ শুরু করে দিন তাহলে। যন্ত্রপাতি জোগাড় করে ফেলুন। টাকার জন্যে ভাবনা নেই। কাজটা করতে পারলে যা চাইবেন তাই পাবেন।'

'কি ছিদ্র করতে হবে? বালি, কাদামাটি, খড়িমাটি, নাকি পাথর? না জানলে ঠিক বুঝতে পারব না কোন যন্ত্রটা দরকার।'

'জেলি।'

'অ্যাঁ!' চমকে উঠলাম।

'হ্যাঁ, জেলি,' একই কথা বললেন আবার প্রফেসর। মজা করছেন না। 'ধরে

নিন, জেলির মাঝে ড্রিল ঢোকাতে হবে আপনাকে। ওই রকমই নরম জিনিস।' দেয়ালের বিশাল ঘড়িটার দিকে তাকালেন। 'অনেক কথা বললাম। জরুরী কাজ আছে আমার। আপনি এখন উঠুন। অফিসে গিয়ে কন্ট্রাক্টের কাগজপত্র রেডি করে ফেলুন। পাকাপোক্ত কাজ পছন্দ আমার। কখন কার বিরুদ্ধে মামলা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কে জানে। দুনিয়ার কোন মানুষকে বিশ্বাস নেই। ঠিক আছে, যান।'

উঠলাম। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে তাকালাম। আশ্চর্য! ঘাড় গুঁজে লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন চ্যালেঞ্জার। আস্তে করে ডাকলাম, 'প্রফেসর?'

'বিদেয় হননি এখনও!' খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর। খানিক আগে যে আমার সঙ্গে ভাল আচরণ করেছিলেন তার বিন্দ্রমাত্রও অবশিষ্ট নেই। এ যেন আরেক চ্যালেঞ্জার।

'প্রফেসর, এক্সপেরিমেন্টটা আপনার অসাধারণ। কিন্তু উদ্দেশ্যটা···'

'এক্ষুণি বেরোন!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। গর্জন করে বললেন, 'অকারণ কৌতূহল মোটেও পছন্দ নয় আমার! দাঁড়িয়ে রইলেন যে! গেট আ-উ-ট!'

একলাফে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে এলাম। পর্দার অন্য পাশে এসে আবার দাঁড়ালাম। এতটা রাগার পর কি করছেন প্রফেসর দেখার লোভটা সামলাতে পারলাম না কিছুতে। পর্দা সামান্য ফাঁক করে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। কোনদিকে নজর নেই প্রফেসরের। ঘাড় গুঁজে কি যেন লিখছেন। বেমালুম ভুলে গেছেন আমার কথা। সত্যি এক আজব চরিত্র!

বেরিয়ে এলাম বাইরে।

আমার অফিসে ফিরে দেখি ম্যালোন বসে আছে। সাড়া পেয়ে ঘুরে তাকাল। চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ শোনার প্রচণ্ড লোভ সামলাতে পারেনি। চলে এসেছে।

আমার আপাদমস্তক ভাল করে দেখল সে। 'হাত-পা তো আস্তই আছে! পেটায়নি?' যেন না পেটানোয় খুব নিরাশ হলো। 'দেখা না করেই চলে আসিসনি তো?'

'অতটা কাপুরুষ কি আমাকে মনে হয় তোর?'

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কাছে সবাই কাপুরুষ। আসল কথা বল। কেমন লাগল বুড়োটাকে?'

'দাম্ভিক, উদ্ধত, চাঁছাছোলা, নীরস কথাবার্তা–তুই বললি গুহামানব, আমি তো দেখলাম উন্মাদ। অতিবুদ্ধিমান এক উন্মাদ। তবে···'

'চুপ করলি কেন? তবেটা কি?'

'দুনিয়ার যত খারাপ বিশেষণ আছে, সব প্রয়োগ করা যায় তাঁর ওপর; কেবল খারাপ মানুষ, এই কথাটা বাদে।'

'মানুষটা যদি খারাপই না হলো, তাহলে খারাপ বিশেষণ প্রয়োগ করে লাভটা কি?' হাসতে হাসতে বলল ম্যালোন, 'আসল কথাটা হলো তাঁর মত মানুষকে

আমাদের বুদ্ধি দিয়ে মাপতে যাওয়াটাই বোকামি। আমাদের বেলায় যেটা অশোভন, তাঁর বেলায় সেটাই শোভনীয়।'

'তা জানি না। তবে একটা কথা স্বীকার করতে পারি অকপটে, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার অসাধারণ এক প্রতিভা।'

''আমিও তোর সঙ্গে একমত। বাজে কথার লোক নন তিনি। তাঁর কোন কাজই অকাজ নয়। হেংগিস্ট ডাউনের ব্যাপারে কিছু বলেছেন?'

'বলেছেন।'

'পৃথিবীকে খোঁচা মারার আইডিয়াটা তোর কেমন লাগল?'

'পাগলামি।'

'কিন্তু অবাস্তব নয়, অন্তত চ্যালেঞ্জারের জন্যে। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেন তিনি। দেখিস, তাঁর এই এক্সপেরিমেন্ট সফল হবে। তোকে যা যা করতে বলেছেন, রেডি করে ফেল।'

এরপর কয়েক সপ্তাহ আর কোন খবর নেই। প্রফেসরের কথামত সব তৈরি করে ফেলেছি। চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমাকে কি ভুলেই গেলেন নাকি প্রফেসর? এই সময় একদিন এসে হাজির হলো ম্যালোন।

'প্রফেসরের খবর কি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তিনিই পাঠিয়েছেন।'

'পাইলট ফিশ হাঙরের আগে আগে ছোটে।'

'হ্যাঁ, আমি পাইলট ফিশই। হাঙরের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব, এতেই পাইলটের স্বস্তি। ওসব কথা থাক। চ্যালেঞ্জার তো প্রায় শেষ করে এনেছেন সবকিছু। যে কোন সময় ভেল্কি দেখিয়ে বসবেন। তোর খবর কি?'

'আমি রেডি। হুকুম হলেই কাজ শুরু করব।'

'ভাল। তোর সম্পর্কে প্রফেসরের ভাল ধারণা। শেষ পর্যন্ত নিজের বদনাম করিসনে। চল, ওঠ। ট্রেনে যেতে যেতে বলব কি করতে হবে তোকে।'

২২ মে। বসন্তের মধুর সকাল। প্রফেসরের সঙ্গে শুরু হলো আমার এক আজব কর্মকাণ্ড। রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হতে চলেছি।

ট্রেনে বসে একটা চিঠি বের করে দিল আমাকে ম্যালোন। চ্যালেঞ্জার লিখেছেন। আমাকে কি কি করতে হবে চিঠিতেই জানিয়েছেন।

'মিস্টার পিয়ারলেস জোনস,

'হেংগিস্ট ডাউনে পৌঁছে চীফ এঞ্জিনিয়ার মিস্টার বার ফোর্থের সঙ্গে দেখা করুন। আমার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে অনেকাংশে সাহায্য করছেন তিনি। ম্যালোনের হাতে চিঠি পাঠালাম, ওর মাধ্যমেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। আমার সময় খুব কম। সবার সঙ্গে সব সময় ব্যক্তিগতভাবে দেখা করা সম্ভব নয়।

'শুনুন, চোদ্দ হাজার ফুট নিচে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে দেখেছি। পৃথিবীর দেহ সম্পর্কে আমার ধারণাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়েছে। আরও

জোরাল প্রমাণ দরকার। নইলে নির্বোধ বিজ্ঞানী মহলের জড়মস্তিষ্ককে নাড়া দেয়া যাবে না। প্রমাণ সংগ্রহ করতে আপনার সাহায্য বেশি প্রয়োজন। লিফটে চড়ে পাতালে নামার সময় যদি চোখ থাকে তো দেখতে পাবেন, মাধ্যমিক খড়িস্তর, কয়লার স্তর, গ্র্যানিট পাথর, ইত্যাদি। এই গ্র্যানিটের স্তর অতিরিক্ত পুরু। কূয়ার একেবারে তলাটা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। খবরদার, ওই ত্রিপলে হাত দেবেন না। ওখানেই পৃথিবীর স্পর্শকাতরতা সবচেয়ে বেশি। মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

তলদেশ থেকে বিশ ফুট ওপরে কূয়ার দেয়ালে আড়াআড়িভাবে লোহার দুটো মজবুত বরগা লাগানো হয়েছে। ওই বরগাতে মোটর বসাবেন। একশো ফুট ড্রিলের দরকার নেই আর, পঞ্চাশ ফুট হলেই চলবে। বরগার সঙ্গে শক্ত করে মোটর বাঁধবেন, যেন খুলে না পড়ে। তাহলে এত কষ্ট সব ভেস্তে যাবে। গোলমাল করে দেবে সব। কিছু জানার বা বলার থাকলে ম্যালোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন।'

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সাউথ ডাউন্‌সের উত্তর সানুদেশে স্টরিংটন স্টেশনে পৌঁছুলাম। আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে ঝরঝরে এক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনের বাইরে। কিছু মনে করলাম না। নিতে যে এসেছে এই যথেষ্ট। গাড়িতে উঠে বসলাম।

এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তা। ভয়ানক ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলল গাড়ি।

মাত্র ছ'সাত মাইল পথ। ওটুকু যেতেই কোমর বাঁকা হয়ে গেল। পিঠে ব্যথা। রাস্তায় আর কোন গাড়ি দেখলাম না, লোকজনও বড়ই কম। তবে রাস্তায় চাকার দাগ বিস্তর। মালপত্র নিয়ে ভারি গাড়ি যাতায়াত করছে প্রচুর। এক জায়গায় একটা ভাঙা লরি পড়ে থাকতে দেখলাম। কোনমতেই আর চালাতে না পেরে ফেলে চলে গেছে ড্রাইভার। আরেক জায়গায় রাস্তার পাশে ঘাসের মধ্যে পড়ে আছে মরচে ধরা বিশাল এক যন্ত্র। হাইড্রলিক পাম্প।

শুকনো হাসি হাসল ম্যালোন, 'বুঝলি কিছু?'

'কি বুঝব?' অবাক চোখে তাকালাম ম্যালোনের দিকে।

'প্রফেসরের কাণ্ড। যে জিনিস চেয়েছিলেন, যন্ত্রটার পাম্পের মাপ তারচেয়ে সামান্য একটু কম। এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ। তাতেই খেপে গেছেন চ্যালেঞ্জার। বাতিল করে দিয়েছেন যন্ত্র। একটা পাইপয়সাও দেননি কোম্পানিকে।'

'আদালতে কেস করেনি কোম্পানি?'

'করেছে। লাভ কি? দোষটা তো ওদেরই। কম হলো কেন? সে-জন্যেই বলছি, যা করতে বলবেন তিনি, অক্ষরে অক্ষরে পালন করবি। একটু গোলমাল করলেও পয়সা তো পাবিই না, খেসারত দেয়া লাগবে।'

ভয়ই করতে লাগল। বাদই দেব নাকি কাজটা? এখনও সময় আছে।

আমি কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল ড্রাইভার। কাঁটাতারের বেড়া দেয়া। এক জায়গায় গেট। গেটের একপাশ থেকে বিশালদেহী

এক লোক এসে দাঁড়াল গাড়ির কাছে। মাথা নামিয়ে জানালা দিয়ে ভেতরের আরোহীদের দেখল। মস্ত বড় কান লোকটার। এত বড় কান আর কোন মানুষের দেখিনি আমি। যোগ্য প্রফেসরের যোগ্য দারোয়ান বটে।

'জেনকিনস, আমি ম্যালোন।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা। খটাস্ করে বুট ঠুকে স্যালুট করল। একেবারে মিলিটারি কায়দা। 'আমি ভেবেছিলাম, স্যার, আমেরিকান অ্যাসোশিয়েটেড প্রেসের সেই জোঁকটা।'

'ওদের লোক এসে গেছে নাকি?'

'এসেছিল। দূর দূর করে তাড়ানো হয়েছে। একটু আগে টাইমস থেকেও এক ব্যাটা এসেছিল। তাড়িয়েছি ওকেও। একেবারে ফলের মাছি। ভনভন করে এসে ছেঁকে ধরে। ওই দেখুন না,' আঙুল তুলে দেখাল গার্ড। বেশ অনেকটা দূরে চকচক করছে কি যেন। 'টেলিস্কোপ বসিয়েছে শিকাগোর ডেইলি নিউজের লোক। আঠার মত লেগে আছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে ওরা।'

'আসুক। তোমার কাজ তুমি করো।'

গাড়ি থেকে নেমে আমাকে নিয়ে এগোল ম্যালোন। ভেতরে ঢুকে কয়েক গজ এগিয়েছি, এমন সময় পেছন থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'ম্যালোন, প্লীজ, ম্যালোন···'

চমকে ফিরে তাকালাম। বেঁটে, মোটা একজন লোককে জাপটে ধরেছে জেনকিনস।

'ছাড়ো না! ছাড়ো!' চেঁচাচ্ছে লোকটা। 'উহ্, পাঁজরা ভেঙে যাচ্ছে! ম্যালোন, প্লীজ, বলো না কিছু···'

'জেনকিনস! ছেড়ে দাও ওকে,' ডেকে বলল ম্যালোন। গেটের দিকে এগিয়ে গেল। 'কি হে, বরবটি? এখানে কি? ফ্লিট স্ট্রীটের রাজত্ব ছেড়ে সাসেক্সে এসেছ কেন মরতে?'

'তুমি যে জন্যে এসেছ,' জেনকিনসের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বুক ডলতে ডলতে বলল লোকটা, 'হেংগিস্ট ডাউন রহস্যের ওপর ফিচার লিখতে হবে। বসের হুকুম। তথ্য না নিয়ে যেন না ফিরি।'

'কিন্তু রয়, ভেতরে ঢুকতে হলে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের অনুমতি লাগবে,' বলল ম্যালোন।

'চেষ্টা করেছিলাম। গিয়েছিলাম আজ সকালে।'

'তারপর?' চেয়ে দেখলাম চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে ম্যালোনের চোখ-মুখ।

মুখ কালো করে জবাব দিল রয়, বলল, 'অনুমতি দেবার আগে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেললে কেমন হয়?'

হাসিটা আর চেপে রাখতে পারল না ম্যালোন। আমিও হেসে উঠলাম।

'তুমি কি বললে?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল ম্যালোন।

'বললাম, খুব খারাপ হয়,' বলেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। 'ভেবেছিলাম, বাঁচলাম। কোথায়! আমার পেছন পেছন তীরবেগে বেরিয়ে এল

বুড়ো ভালুকটা। আমার ক্যামেরাটা হাত থেকে পড়ে গেল। ওটা তুলে ছুঁড়ে মারল গরিলাটা। সোজা এসে পিঠে লেগেছে। আরেকটু বাঁয়ে লাগলেই মেরুদণ্ডটা যেত। কসম খেয়ে ফেলেছি আর কোনদিন অত ভারি ক্যামেরা কিনব না। কোনমতে ওটা কুড়িয়ে নিয়ে দে ছুট। আর পেছন ফিরে তাকাইনি। ওফ্, ওই পাগলটার সঙ্গে কি করে টিকে আছ তুমি, ম্যালোন?'

হা-হা করে হাসতে লাগলাম। টেরা চোখে আমার দিকে তাকাল সাংবাদিক। মনে হলো আমার হাসি ভাল লাগছে না ওর।

'থাকাটা যে সহজ না, সে তো নিজেই বুঝলে,' ম্যালোন জবাব দিল। 'শোনো, একটা উপদেশ দিচ্ছি তোমাকে। প্রফেসরের পেছনে লেগো না। ধরা পড়লে একটা হাড়ও আস্ত থাকবে না। অযথা মাঠে-ঘাটে পড়ে না থেকে নিজের অফিসে ফিরে যাও। দিন কয়েকের মধ্যেই প্রফেসর তোমাদের ডেকে পাঠাবেন। যাও।'

'ঢোকা তাহলে যাবে না এখন?'

'না।'

সামনে ঝুঁকে এল রয়। 'কিছু মালপানি ছাড়লে···'

'নিজের কর্মচারীদের প্রচুর টাকা বেতন দেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।'

'বাড়তি কিছু পেলে নেবে না?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো। লাভের মধ্যে পাঁজরের ক'খান হাড় ভাঙবে।'

আর কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল ম্যালোন। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোল। আমাকে বলল, 'ওর নাম রয় পার্কিন্স। ওয়ার ফিল্ড রিপোর্টার। এক সময় দু'জনে একসঙ্গে কাজ করেছি। নিজেকে অজেয় ভাবে সে। খবর জোগাড়ের জন্যে দুনিয়ার কোন বাধাকেই বাধা মনে করে না। সেই অহঙ্কার ভাঙল আজ।'

দূরে কতগুলো বাড়ি। টালির ছাত। ছবির মত সাজানো এক কলোনি। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল ম্যালোন। বলল, 'ওগুলো ওয়ার্কারদের ঘর। মোটা মাইনে পায়, থাকার এমন সুব্যবস্থা। কাজেই অসৎ উপায়ে পয়সা রোজগারের কথা ভাববেই না। তা ছাড়া সব ক'জন অবিবাহিত। মদ খায় না। সেজন্যেই অত চেষ্টা করেও ভেতরের কোন কথা ফাঁস করতে পারেনি রিপোর্টাররা।'

বুড়ো বিজ্ঞানীর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে এমন চমৎকার হবে ভাবতে পারিনি।

একটা বাংলোমত বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। বারান্দায় পায়চারি করছেন রোগা, লম্বা, বিষণ্ন চেহারার এক লোক। আমাদের দেখে বারান্দা থেকে নেমে এগিয়ে এলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিই এঞ্জিনিয়ার জোনস?'

আমি মাথা নাড়তে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমি বার ফোর্থ।'

হাত মেলালাম।

ফোর্থ বললেন, 'আপনি এসেছেন, বেঁচেছি। উফ, একেবারে শেষ হয়ে গেছি! যা টেনশন! নিন, দায়িত্ব নিন এবার। আমাকে বাঁচান! বাবারে বাবা! কম ঝামেলা! কূয়া খুঁড়েই চলেছি। কখনও ছিটকে বেরিয়ে আসছে চক মেশানো পানির

ফোয়ারা, কখনও কয়লার খনি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কখনও পথ আটকাচ্ছে তেল, আবার কখনও গনগন করে উঠছে আগুন। গ্র্যানিট পাথরের কথা আর না-ই বা বললাম!'

'নিচে কি খুব গরম?'

'মোটামুটি। বদ্ধ বাতাসে যতটুকু ভাপসা হয় তারচেয়ে বেশি।'

'প্রফেসরের খবর কি? নিচে নেমেছেন কখনও?'

'গতকাল নেমেছিলেন। কাজ দেখে ভারি খুশি!···যাকগে, আজ দুপুরে আপনারা আমার এখানে খাবেন। খাওয়ার পর আপনার কাজ বুঝিয়ে দেব।'

উত্তেজনায় খিদে মরে গেছে। খেলাম অতি সামান্যই। খাওয়ার পর আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ফোর্থ। প্রথমে নিয়ে গেলেন এঞ্জিন হাউসে। শেডের বাইরে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে আছে বিস্তর ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি। লোহার দরে বেচে দেয়া ছাড়া ওগুলো আর কোন কাজেই লাগবে না। একপাশে একটা প্রকাণ্ড অ্যারল হাইড্রলিক বেলচা পড়ে থাকতে দেখলাম। শুরুতে এটা দিয়েই মাটি খোঁড়া হয়েছিল। ওটার পাশে আরেকটা অতিকায় মেশিন। ইস্পাতের দড়িতে বালতি বেঁধে পাতালে নামিয়ে আলগা বালি আর মাটি তুলে আনার কাজ করা হতো এই যন্ত্রের সাহায্যে। এঞ্জিন হাউসের ওপরে পাওয়ার হাউস। ওখানে উঠে দেখলাম হেলায় পড়ে আছে কয়েকটা শক্তিশালী টারবাইন এঞ্জিন। মিনিটে একশো চল্লিশবার ঘোরার ক্ষমতা রাখে প্রতিটি টারবাইন। হাইড্রলিক অ্যাকুমুলেটর চালু রাখে। ফলে তিন ইঞ্চি পাইপের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে চার-চারটে ভীষণ শক্তিশালী রক ড্রিল, ঘুরতে থাকে ব্র্যান্ড টাইপের ধারাল ফলা। একটা দু'শো হর্স পাওয়ারের বিশাল টারবাইন দেখলাম। দশ ফুট পাখা ঘুরিয়ে বারো ইঞ্চি পাইপের মধ্যে দিয়ে চাপ চাপ বাতাস সুড়ঙ্গে ঢোকানোর কাজ করছে এটা।

আশপাশ ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে দেখছিলাম প্রকাণ্ড যন্ত্রপাতিগুলো। পরিচিত ঝনঝন শব্দে ফিরে তাকালাম। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা লরি।

নিচে নেমে এলাম। বিশাল লেল্যান্ড লরিটা আমারই। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পাইপ এবং অন্যান্য বিস্তর টুকিটাকি জিনিস নিয়ে এসেছে। পেছনে মালপত্রের ওপর চেপে বসে আছে ফোরম্যান পিটার। তার পাশে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে সারাগায়ে কালিঝুলি মাখা অ্যাসিসট্যান্ট।

এঞ্জিন হাউসের কাছে এসে থামল লরি। লাফ দিয়ে নামল পিটার। তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ফোর্থ আর ম্যালোনের সঙ্গে কূয়ার কাছে চললাম।

আজব জায়গা। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এলাহী কাণ্ড চলছে। কূয়ার মুখ ঘিরে ঘোড়ার খুরের আকৃতির ছোটখাট এক পাহাড়। অশ্ব-খুর পাহাড় নাম রাখলে চমৎকার মানিয়ে যাবে। কূয়া কাটার সময় খুঁড়ে আনা মাটি, পাথর আর কয়লা জমে সৃষ্টি হয়েছে ওই পাহাড়। পাহাড়ের ঢালে বসানো সারি সারি লোহার থাম, বড় বড় চাকাওয়ালা যন্ত্র, পাম্প মেশিন এসব। বিশাল থামে ইস্পাতের বরগা পেতে পাতালে নামার লিফট ঝোলানো হয়েছে। পাহাড়ের একপ্রান্তে কূয়ার পাড়ে একটা লম্বা পাকা বাড়ি। এই বাড়ির একদিকের প্রান্তে পাম্পটা বসানো।

পাহাড়ে গিয়ে উঠলাম। নিচে ঝুঁকে কূয়ার দিকে তাকালাম। প্রকাণ্ড মুখ হাঁ

করে আছে। তেরছাভাবে বিকেলের রোদ পড়েছে গর্তের মুখে, ভেতরের কয়েকশো ফুট পর্যন্ত দেখা যায়। প্রথমে খড়িমাটির স্তর। আলগা মাটি ঝরে পড়ার সম্ভাবনা রোধ করা হয়েছে ইঁটের গাঁথনি দিয়ে। অনেক নিচে আলপিনের মাথার মত ছোট্ট একটা আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। নড়ছে মনে হলো আলোটা। গভীর গর্তের দিকে কয়েক সেকেন্ডের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। মাথা ঘুরে উঠল।

আলোকবিন্দুটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কিসের আলো?'

'লিফট,' পাশ থেকে বলল ম্যালোন। 'গর্তটা আটমাইল গভীর। লিফট ছাড়া নামার উপায় নেই। শক্তিশালী আর্কলাইট জ্বালানো হয় লিফটে। চলেও খুব জোরে। এই তো, উঠে এল বলে। নামবি নাকি?'

'নামতে তো হবেই,' বললেন ফোর্থ। 'ওনার কাজটাই তো তলায়।'

দ্রুত বড় হচ্ছে আলোকবিন্দু। গাঢ় অন্ধকারে নক্ষত্র গতিতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই ধেয়ে এল। প্রখর দীপ্তিতে দিনের আলোর মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কূয়া। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ঘট-ঘট-ঘটাং করে থামের মাথায় বসানো ধাতব চাতালে এসে ঠেকল লিফটের ছাত। ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল চারজন লোক।

'দুই ঘণ্টা শিফটে কাজ করে এরা,' বললেন ফোর্থ। 'নতুন চারজন নামবে এবার। মিস্টার ম্যালোন, যাবেন নাকি আবার?'

'চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি করব?'

নামতে হলে বিশেষ পোশাক পরে নেয়া লাগে। ফোর্থের সঙ্গে এঞ্জিন হাউসের লাগোয়া একটা ঘরে গেলাম। হালকা তসর জাতীয় কাপড়ের পোশাক বের করে দিলেন ফোর্থ। 'জুতো, মোজা, জামা-কাপড় সব খুলে ফেলুন। কূয়ার নিচে ওসব জিনিস নিরাপদ নয়।'

পরনের সব কাপড়-চোপড় খুলে বিশেষ পোশাক পরে নিলাম। পায়ে দিলাম রবারের চটি।

বেরোনোর উপক্রম করছি এমন সময় বাইরে চেঁচামেচি শোনা গেল। সেই সঙ্গে কুকুরের উত্তেজিত চিৎকার।

ছুটে বেরিয়ে গেল ম্যালোন।

আমিও বেরোলাম। দেখি পিটারের তেলকালি মাখা অ্যাসিসট্যান্টকে মাটিতে চেপে ধরেছে এক গার্ড। গোটা দশেক কুকুর ওদের ঘিরে ঘেউ ঘেউ করছে। লোকটার কাছ থেকে কি যেন কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে গার্ড।

গায়ের জোরে গার্ডের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না লোকটা। ওর হাত থেকে জিনিসটা কেড়ে নিয়ে এক আছাড়ে ভেঙে ফেলল। তারপর পা দিয়ে মাড়িয়ে চুরমার করতে লাগল। একটা ক্যামেরা। অবাক হয়ে দেখলাম, পিটারের অ্যাসিসট্যান্ট সেজেছে সেই রয় পার্কিন্স। লরিতে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল। অতটা খেয়াল করিনি। ছদ্মবেশটা ভালই ধরেছে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রয়। ছড়ে যাওয়া কনুই ডলতে লাগল। চোখে গোখরোর বিষ। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'দুই পয়সার গার্ড, তোমাকে আমি দেখে নেব! আমার এত দামের ক্যামেরাটা ভাঙলে। তোমাকে আমি ছাড়ব না!'

'দোষটা তোমারই, রয়,' নীরস কণ্ঠে বলল ম্যালোন, 'বিনা অনুমতিতে ঢুকেছ। ছবি তুলেছ নিশ্চয়। নাহলে ক্যামেরাটা ভাঙত না।'

আমারও রাগ হলো। কড়া গলায় ধমকে উঠলাম, 'আমার কোম্পানির ইউনিফর্ম পেলেন কোথায়?'

মিটিমিটি হাসতে লাগল রয়।

রাগে আরও পিত্তি জ্বলে গেল আমার। প্রথম দর্শনেই লোকটাকে খারাপ লেগেছে। এমন ভঙ্গিতে হাসছে, ঠাস করে এক চড় মারতে ইচ্ছে করল।

গা জ্বালানো হাসি হাসতে হাসতে রয় বলল, 'আমার অসাধ্য কাজ দুনিয়ায় নেই। গেটের বাইরে প্রস্রাব করতে দাঁড়িয়েছিল আপনার অ্যাসিসট্যান্ট, আশেপাশে আর কেউ ছিল না। পেছন থেকে আধলা ইঁট দিয়ে মারলাম মাথায় এক বাড়ি। টুঁ শব্দটি করতে পারল না। ওকে টেনে নিয়ে গেলাম ঝোপের আড়ালে। দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে ওর ইউনিফর্ম পরে লরিতে উঠে বসলাম। আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম সারাক্ষণ। আপনার ফোরম্যান তাই চিনতে পারেনি।' বলে খিকখিক করে হাসতে লাগল অসহ্য লোকটা।

চিৎকার করে উঠলাম, 'আবার হাসছেন! আপনাকে পুলিশে দেয়া উচিত!'

'ভাল চাও তো জলদি বেরোও!' ম্যালোন বলল। 'প্রফেসর এসে দেখে ফেললে ক্যামেরার দশা আর তোমার দশা একরকম হবে। যাও, পালাও।'

হই-হল্লা শুনে জেনকিনস এবং আরও একজন গার্ড ছুটে এল। রয়কে দেখিয়ে বলল ম্যালোন, 'একে বের করে দিয়ে এসো। খেয়াল রেখো, আর যেন কোনমতেই ঢুকতে না পারে।'

দু'দিক থেকে ধরে চ্যাংদোলা করে রয়কে নিয়ে চলল দুই গার্ড। সুযোগ দিলেই কিলানো আরম্ভ করবে। সেটা বুঝে চুপ করে রইল সে।

এই ঘটনার পরদিন 'অ্যাডভাইজার' পত্রিকায় এক 'চাঞ্চল্যকর' নিবন্ধ বেরোল। লেখক স্বয়ং রয় পার্কিন্স।

হেড টাইটেল:

পাগল বৈজ্ঞানিকের উন্মাদ স্বপ্ন।

নিচে সাব-টাইটেল:

অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার সরাসরি পথ।

নিবন্ধটা পড়ে সন্ন্যাস রোগ হতে হতে অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, আর এর ফলে নিজের অফিসে বসেই 'গরিলা-মানবের' হাতে জানটা যেতে বসল অ্যাডভাইজার-এর সম্পাদক সাহেবের। তার পরদিন সে-কথাও ফলাও করে ছাপা হলো পত্রিকায়। গরিলা-মানব নামটা তাদের দেয়া। অতএব অতিরিক্ত সাবধানতা বশত দ্বিতীয় দিন আর অফিসে থাকলেন না সম্পাদক সাহেব।

যাই হোক, আগের নিবন্ধটায় রয় পার্কিন্স তার সমস্ত প্রতিভা সন্নিবেশিত করেছে। অনেক রঙ চড়িয়ে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে চুটিয়ে লিখেছে 'কাঁটাতার ঘেরা গলাকাটা গুণ্ডা বেষ্টিত টহলদার ব্লাডহাউন্ড প্রহরিত' কম্পাউন্ডে বহু অভিজ্ঞ ওয়ারফিল্ড রিপোর্টারের রোমহর্ষক অভিযান কাহিনী। 'এনমোর গার্ডেন্সের রোমশ

ষাঁড়টা' নাকি 'অ্যাংলো অস্ট্রেলিয়ান সুড়ঙ্গ' প্রায় শেষ করে এনেছে। কিন্তু তাঁর 'ভাড়াটে গুণ্ডারা' সুড়ঙ্গমুখের কাছ থেকে মারতে মারতে বের করে দিয়েছে রয় পার্কিন্সকে। তাঁর ক্যামেরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। 'গুণ্ডাদের' কাউকে কাউকে চেনে রয়। এদের একজন নাকি সাংবাদিক হবার সুদূর স্বপ্ন নিয়ে পত্রিকা পাড়ায় অনেকদিন ঘুরঘুর করেছে, কিন্তু ক্ষমতায় কুলোয়নি বলে সে-চেষ্টা বাদ দিয়েছে। আরেকজনের পৈশাচিক চেহারা, পোশাকও পরেছে তেমনি। হেলপার হবার যোগ্যতা তার নেই, অথচ নিজেকে এঞ্জিনিয়ার বলে জাহির করে।

এমনি সব চমৎকার বর্ণনা দিয়ে আমাদের পিণ্ডি চটকে মনের বোঝা অনেকখানি হালকা করেছে রয়। আমরা ব্যাপারটা ভুলে গেলেও প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ভুললেন না। আর এর জন্যে ফ্লীট স্ট্রীটের প্রায় সব রিপোর্টারকে খেসারত দিতে হলো নিদারুণভাবে।

যা হোক, আগের কথায় ফিরে আসি। পিটারের অ্যাসিসট্যান্টকে উদ্ধার করে আনল জেনকিনস। তাকে নিয়ে কাজে লেগে গেল পিটার। কয়েকজন শ্রমিকও এসে কাজে হাত লাগাল। লরি থেকে মাল খালাস করতে লাগল। অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি: বেলবক্স, ক্রোজফুট, ভি-ড্রিল, স্কেল এবং আরও অনেক কিছু।

আমি, ম্যালোন আর মিস্টার ফোর্থ গিয়ে লিফটে চড়লাম। লিফট মানে ইস্পাতের শক্ত, মোটা তারে ঘেরা খাঁচা। হু-হু করে পাতালে নেমে চলল লিফট। নামার সময় দেখলাম, আরও লিফট ওঠানামা করছে কূয়ায়। কয়েকটা লাইন।

লন্ডনের অন্য সব সাধারণ লিফটের মত নয় এখানকার খাঁচাগুলো। হালকা, অনেক বেশি মজবুত, দ্রুতগামী। ঝড়ের গতিতে নামছে। অথচ টেরই পাচ্ছি না তেমন। ওপর থেকে তীব্র গতিতে নিচে নামার সময় যে রকম অনুভূতি হওয়ার কথা, সেসব কিছুই হচ্ছে না।

কূয়ার দেয়ালে লাগানো হয়েছে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলো। স্পষ্ট দেখা যাবে সবকিছু।

চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে মাটির একটার পর একটা স্তর। সাঁৎ সাঁৎ করে ওপর দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। খড়িস্তর, কফিরঙা হেংগিস্ট স্তর, তারপর কুচকুচে কালো কয়লার স্তর–মাঝে মাঝে কাদামাটির বলয়।

ইঁটের গাঁথনি দিয়ে আলগা মাটি জায়গায় জায়গায় ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে যাতে ধসে না পড়ে। এত গভীর কূয়া, অথচ খোঁড়ার গুণে ধসে পড়ছে না। আশ্চর্য! দেখলে তাক লেগে যায়! কি পরিমাণ যান্ত্রিক দক্ষতা আর মেহনতের ফলে সম্ভব হয়েছে এই কাজ, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। এর পরিকল্পনা যিনি করেছেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে মাথা। বলাবাহুল্য, প্ল্যানটা করেছেন স্বয়ং প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

কয়লার খনির ঠিক নিচে তাল তাল সিমেন্টের ডেলা দেখলাম বলে মনে হলো। লিফটের দ্রুতগতির জন্যে শিওর হতে পারলাম না।

হুস করে গ্র্যানিট স্তরে নেমে এল লিফট। উজ্জ্বল আলোয় লক্ষ হীরের মত ঝকমক করছে দেয়ালের গায়ে বেরিয়ে থাকা কোয়ার্জ ক্রিস্টালের দানা।

নেমে গেলাম আরও নিচে। মাটির এতটা গভীরে নামতে পারব, কল্পনাও

করিনি কোনদিন। চোখের সামনে তীরবেগে উঠে যাচ্ছে প্রাচীন পাথরের বিচিত্র নমুনা। লালচে-সাদা ফেল্‌স্‌পার স্তরের সৌন্দর্যের কথা জীবনে ভুলতে পারব না। গোলাপী রঙের আদিম পাথর অপার্থিবরূপে ঝলমল করছে। দেয়ালের গা থেকে বেরোচ্ছে যেন গোলাপী বিদ্যুতের ছটা।

যতই নামছি, উত্তাপ বাড়ছে। ভারি, ভাপসা হচ্ছে বাতাস। ঘাম বেরোচ্ছে দরদর করে। গায়ের সাথে লেপ্টে গেল হালকা তসরের পোশাক। এক সময় গরম যখন অসহ্য হয়ে উঠল, ঠিক তখনই চাতালের ওপর থেমে গেল লিফট। চীফ এঞ্জিনিয়ারের নির্দেশে লিফট থেকে চাতালে নামলাম।

অবাক হয়ে চারদিকের দেয়াল দেখছে ম্যালোন। সাহসী লোক বলে জানি ওকে। জানি সহজে ভয় পাওয়ার লোক নয় সে। অথচ ওর চোখেও আতঙ্ক ফুটতে দেখলাম। এরপর আমার ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু কি দেখে অত ভয় পেল ম্যালোন?

দেয়ালে হাত বোলালেন এঞ্জিনিয়ার। তারপর হাতটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'দেখছেন, গাঁজলা মত জিনিস বেরোচ্ছে? হাত দিয়ে দেখুন, চটচটে। প্রফেসর তো দেখে খুশিতে নাচতে আরম্ভ করেছিলেন। আমি কিছুই বুঝিনি। দেখুন কি রকম থরথর কাঁপছে দেয়াল। এরপর যতই নিচে নামবেন, দেয়ালের এই কাঁপুনি দেখবেন। কাঁপছে এ ভাবে সারাক্ষণ। মাটি কাঁপে জ্যান্ত জীবদেহের মত, শুনেছেন কখনও?'

'আগের বারও এ ভাবেই কাঁপতে দেখেছি দেয়াল,' ম্যালোন বলল। 'তোর মোটর আর ড্রিল বসানোর জন্যে বরগা ঢোকানো হচ্ছিল তখন। ভীষণভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছিল দেয়ালটা, যেন প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছে। প্রফেসরের আজগুবি গল্প আর আজগুবি মনে হয় না এখন!'

'তলায়, তেরপলের নিচে কি আছে দেখলে ভিড়মি খাবেন,' আরও ভয় ধরিয়ে দিলেন ফোর্থ। 'মাটি মাখনের মত নরম। অতি সহজে কেটে গেছে। তার নিচে আরেকটা অদ্ভুত স্তর। মাটির আট মাইল নিচে যে এ জিনিস থাকবে দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিনি।'

'কিসের স্তর?' জানতে চাইলাম।

'দেখতে চান?'

'ওখানে যখন ড্রিল বসাতে হবে আমাকে, না দেখে কিভাবে কাজ করি?'

'ঠিক আছে, আসুন। খবরদার, চাপটাপ দেবেন না এখনি। প্রফেসর বলেছেন, সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে তাহলে।'

আমাদের আরেকটা লিফটে নিয়ে গেলেন ফোর্থ। এই লিফট গর্তের একেবারে তলায় নিয়ে যাবে।

তেরপলের ফুটখানেক ওপরে থামল লিফট।

'নিন, দেখুন,' ভয়ে ভয়ে বললেন আমাকে ফোর্থ।

সাবধানে তেরপলের এক কোণ ধরে টান দিলাম। উজ্জ্বল আলোয় তলার জিনিসটা দেখে শিউরে উঠলাম।

ধূসর বর্ণের চকচকে একটা তিমির পিঠের মত জায়গা। গাঁজলা মাখা। শ্বাস

ফেলার ছন্দে যেন ধীর গতিতে উঠছে আর নামছে। মৃদু তরঙ্গের ক্ষীণ আভাস, স্পন্দনবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে ওপর দিয়ে। হালকা ঘষা কাচের মত রঙ। ভেতরে আবছা কোষের মত জিনিস দেখা যাচ্ছে। সাদাটে অস্বচ্ছ বস্তুর মাঝে যেন অজানা এক রহস্যময় জগৎ। দুরুদুরু বুকে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই অসাধারণ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এটাই কি সেই জেলি? যার কথা বলেছিলেন প্রফেসর?

ফিসফিস করে কথা বলল ম্যালোন। আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর। যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠে সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে জ্যান্ত ভয়ঙ্কর পৃথিবী। একটা ছাল ছাড়ানো জন্তু যেন! প্রফেসরের-ইকিনাস তথ্যই তো সত্যি হতে যাচ্ছে দেখছি! তাঁকে পাগল ভেবেছি, আসলে মাথামোটা তো আমরাই।

'সর্বনাশ! এর মধ্যে ড্রিল গাঁথব আমি!' ভয়ে কেঁপে উঠল আমার গলা।

'সেটা তোর সৌভাগ্য,' আমার কাঁধে হাত রাখল ম্যালোন। 'এবং আমার চরম দুর্ভাগ্য, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোর সঙ্গে থাকতে হবে।'

'আমি থাকছি না,' সাফ বলে দিলেন এঞ্জিনিয়ার। 'প্রফেসর জোর করলে সব ছেড়েছুড়ে সোজা দক্ষিণ আমেরিকায় পালাব। যাতে কোনদিন খুঁজে না পান।'

অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল এ সময়। ধূসর পিচ্ছিল পিঠটা ওপর দিকে ঠেলে উঠতে লাগল বুদ্বুদের মত। তরঙ্গ খেলে গেল তাতে। আস্তে আস্তে বুদ্বুদটা আবার বসে গেল নিচের দিকে। আগের মত ধীরগতিতে স্পন্দিত হতে লাগল পিঠ।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর সইতে পারলাম না। সাবধানে আবার তেরপল নামিয়ে ঢেকে দিলাম।

'আমরা আছি বুঝতে পেরেছে মনে হচ্ছে!' ভয়ার্ত গলায় বললেন ফোর্থ। 'জীবন্ত প্রাণীর মত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও আছে।'

'ফুলল কেন?' ম্যালোনের প্রশ্ন। 'চোখও আছে নাকি? আলো দেখতে পেয়েছে?'

ব্যাপারটা নিয়ে আর আলোচনা করতেও সাহস পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে এবার কি করতে হবে, মিস্টার ফোর্থ?'

চাতালের এক পাশ বরাবর দুটো বরগা ঢোকানো হয়েছে দেয়ালের গায়ে। পাশাপাশি। মাঝখানে নয় ইঞ্চি ফাঁক। এই বরগার ওপর মোটর বসিয়ে ফাঁক দিয়ে ড্রিল ঢোকাতে হবে। কাজটা বুঝিয়ে দিলেন আমাকে এঞ্জিনিয়ার।

'সহজ কাজ,' বললাম। 'আজ থেকেই শুরু করব।'

বলার সময় তো বলে ফেললাম, কিন্তু কি পরিমাণ বিপজ্জনক, কাজে হাত দেয়ার আগে কল্পনাও করিনি।

কূয়া খোঁড়ার অভিজ্ঞতা আমার দীর্ঘদিনের। কিন্তু এখন যে কাজে হাত দিলাম, এ অভিজ্ঞতা আগে তো কোনদিন হয়ইনি; ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না, যদি না আবার চ্যালেঞ্জারের পাল্লায় পড়ি। রিসের গায়ে ড্রিল ঢোকাতে হবে, কল্পনা করে অস্বস্তিতে ঘেমে গেল হাতের তালু।

মোটর চালানোর জন্যে ওপর থেকে বিদ্যুৎ আসবে। আট মাইল লম্বা তার জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়ে আসা হলো চাতালে। মোটরের সঙ্গে যুক্ত করলাম। সুইচ দিলে চলতে থাকবে এখন মোটর।

ফোরম্যান পিটারের সাহায্যে কিছু বিশেষ টিউব লিফটে করে নামিয়ে আনলাম চাতালে। ড্রিল পোঁতায় মাধ্যাকর্ষণ অনেকখানি সাহায্য করে। ভারি ড্রিল নরম মাটির গায়ে অনায়াসে ঢুকে যায় এই আকর্ষণের ফলে।

বরগার ওপর মোটর বসানো কিছু না, কিন্তু ঘাম ছুটে গেল পরের কাজটা করতে গিয়ে। ভয়ের চোটে যতটা না আসল গরম, তার চেয়ে বেশি লাগছে। কাজ করতে গেলে হাত ফসকে ছোটখাট যন্ত্রপাতি পড়ে যাবার ভয় আছে। একবার পড়লেই হলো। আঘাত সহ্য করবে বলে মনে হয় না ওই জেলির মত নরম বস্তুটা। নিমেষে ঘটিয়ে দেবে চরম সর্বনাশ। প্রফেসর এ জন্যেই বার বার সাবধান করেছেন।

এত ভাবলে কাজ করতে পারব না। টানটান হয়ে আছে উত্তেজিত স্নায়ু। জোর করে দুশ্চিন্তা বিদায় করলাম মন থেকে।

নিরাপদেই কাজ শেষ হলো এক সময়। লিফটে করে উঠে এলাম। বাইরে বেরিয়ে গর্তের পাড়েই মাটির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। দপদপ করছে মাথার ভেতর। ফেটে যাবে যেন খুলিটা।

খবর পাঠানো হলো প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কাছে—কাজ শেষ। এবার তাঁর কাজ তিনি করতে পারেন।

সব ঠিকঠাক করে দিয়ে সেদিনই ফিরে এলাম হেংগিস্ট ডাউন থেকে।

তিনদিন পরে এল নিমন্ত্রণ পত্র। চ্যালেঞ্জার লিখেছেন:

প্রফেসর জি· ই· চ্যালেঞ্জার, এফ· আর· এস·; এম· ডি·; ডি· এসসি·-র তরফ থেকে আমন্ত্রণপত্র।

উপলক্ষ: জড় জগতের ওপর মানুষের প্রভুত্বের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সময়: ২১ জুন, মঙ্গলবার, সকাল ১১-৩০।

স্থান: হেংগিস্ট ডাউন, সাসেক্স।

স্টেশন: স্টরিঙটন। ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে সকাল ১০-০৫ মিনিটে বিশেষ ট্রেন ছাড়ার ব্যবস্থা থাকবে। টিকিটের পয়সা নিজের পকেট থেকে দিতে হবে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে পালিয়ে বাঁচার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।

বিঃ দ্রঃ মহিলাদের আসা একেবারেই বারণ। এলে ঢুকতে দেয়া হবে না।

একই রকম আমন্ত্রণপত্র পেল ম্যালোন। লন্ডনের নামী-দামী মানুষদের কাছেও এই পত্র গেল। আর দাওয়াত পেল পত্রিকার লোকেরা। সমস্ত পত্রিকার সম্পাদক থেকে শুরু করে বড় সাহেব, ছোট সাহেব এমনকি পিয়ন-দারোয়ানেরাও বাদ গেল না। খবরটা শুনে অবাক হলাম। হঠাৎ যে কেন ওদের প্রতি এতটা সদয় হয়ে উঠলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বোঝা গেল না।

সোমবার বিকেলে হেংগিস্ট ডাউনে গিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা

শেষবারের মত ভাল করে দেখে এলাম। কোন খুঁত থেকে গেলে আমাকে দেশছাড়া করবেন প্রফেসর।

ঠিকই আছে সব। জাযগামত ঝুলছে ড্রিল, ওজন চাপানো রয়েছে, মোটরের সঙ্গে ইলেকট্রিক কানেকশনের কোন গোলমাল হয়নি। যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তেমনি আছে। সুইচবোর্ড রেখেছি গর্তের মুখ থেকে পাঁচশো গজ দূরে, নিরাপদ দূরত্বে।

মঙ্গলবার। গতরাতে ভাল ঘুম হয়নি। সাংঘাতিক উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন ধরে এসে পৌছুলাম সাউথ ডাউনসে। রোদ ঝলমলে সুন্দর সকাল। হেংগিস্ট ডাউনের মত রুক্ষ জায়গাতেও রঙবেরঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশ ঘন নীল।

লোকে গিজগিজ করছে হেংগিস্ট ডাউন। বৃটেনের সমস্ত মানুষ এসে যেন হাজির হয়েছে। যেদিকে চোখ যায় শুধু লোকের মাথা। বিশ্রী কাঁচা রাস্তাটায় মোটর গাড়ির ভিড়। লন্ডন শহরে নিশ্চয় আর কোন গাড়ি নেই, সব আজ চলে এসেছে। কম্পাউন্ডের গেটে নামিয়ে দিচ্ছে আরোহীদের। অনেক কষ্টে পথ বের করে সরে গিয়ে পার্ক করছে কাঁটাতারের বাইরে ডানদিকের খোলা প্রান্তরে।

ভীষণ-দর্শন একঝাঁক প্রহরী পাহারা দিচ্ছে গেটে। হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। কার্ড চেক করতে করতে ওদের অবস্থা কাহিল। গেটে লোকের ভিড়। যারা কার্ড পায়নি, তারাও এসেছে। অনেক রকমে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে গার্ডদের। কিন্তু ওরা অটল। লোক বাছাই করায় চ্যালেঞ্জারের জুড়ি নেই, বুঝলাম।

খোলা জায়গাটার এক প্রান্তে পাহাড়। যারা কার্ড পায়নি, ভেতরে ঢুকতে না পেরে ওখানে গিয়ে উঠছে। দূর থেকে যদি কিছু দেখা যায়, এই আশায়।

কম্পাউন্ডের ভেতরে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিভিন্ন মর্যাদার মেহমানদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কার্ড পরীক্ষা করে যার যার জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছে গার্ডেরা।

লর্ড সভার সদস্যদের বসার জায়গাটাকে ছাগলের খোঁয়াড়ের মত মনে হলো আমার। হাউস অভ কমনসের মাননীয় সভ্য এবং বিজ্ঞানীদের বসার জায়গাটাও এরচেয়ে উন্নত নয়। টিন আর বালির বস্তা দিয়ে বিশেষ একটা দিক একেবারে আলাদা করে রাখা হয়েছে। ওখানে বসবেন রাজ-পরিবারের তিনজন।

উচ্চমানের সম্মানিত অতিথিরা এলেন সোয়া এগারোটায়, কয়েকটা বিশেষ গাড়িতে চেপে। তাদের সম্মানের সঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দিল কয়েকজন গার্ড।

সবাই এসে যেতে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট মঞ্চে গিয়ে উঠলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। সম্মিলিত ব্যঙ্গের হাসি আর হাততালির রোল উঠল। তীক্ষ্ণ শিসের শব্দও শোনা গেল গোলমাল ছাপিয়ে।

মাথায় উঁচু চূড়াওয়ালা চকচকে ধাতব টুপি পরেছেন চ্যালেঞ্জার। গায়ে সাদা ওয়েস্টকোটের ওপর জমকালো ফ্রককোট। চোখে অবজ্ঞামেশানো চাহনি, যেন

নিমন্ত্রণ করে কৃতার্থ করেছেন মেহমানদের। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে স্পষ্ট অহমিকা। এখানকার কাউকেই নিজের সমকক্ষ তো দূরের কথা, কাছাকাছিও যে ভাবেন না, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

ভিড়ের ভেতর থেকে নতুন করে শিস দিয়ে উঠল কোন্ অভদ্র যেন। অন্য একজন চেঁচিয়ে বলল, 'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার একেবারে জেহোভা কমপ্লেক্সের আদর্শ নিদর্শন।'

শুনছেন সবই, কিন্তু কান দিচ্ছেন না প্রফেসর। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে শুরু করলেন বক্তৃতা:

'ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের অনুষ্ঠানে মহিলাদের আসতে নিষেধ করেছি আমি। তাদের এখানে আসা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না আমি মহিলা-বিদ্বেষী। যাই হোক, ওসব বাজে কথা থাক। আজকে এক বিশেষ এক্সপেরিমেন্ট করতে যাচ্ছি আমি। সফল হবই। কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা আছে প্রচুর,' গর্বিত ভঙ্গিতে আবার একবার সবার দিকে তাকালেন প্রফেসর। হাততালির আশা করলেন বোধহয়, কিন্তু কেউ তালি দিল না আর।

'আপনাদের চেহারায় অস্বস্তি লক্ষ করছি। কেউ বেশি ভয় পেয়ে থাকলে চলে যেতে পারেন। পত্রিকা অফিস থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের জন্যে খুশির খবর আছে। আপনারা সব এদিক ওদিক ছিটিয়ে আছেন কেন? দেখার প্রয়োজন আপনাদেরই বেশি। কারণ পত্রিকার মাধ্যমেই পৃথিবীর সব দেশের লোক আমার পরীক্ষার কথা জানতে পারবে। আপনাদের অনুরোধ করছি, গর্তের মুখের কাছে মাটির পাহাড়টায় গিয়ে উঠে বসুন। পরিষ্কার দেখতে পাবেন সবকিছু। ছবি তোলা সহজ হবে। অনুরোধ করছি বলে ভাববেন না আপনাদের পছন্দ করা শুরু করেছি। ঘৃণাটা সেই আগের মতই আছে। আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখতে পেলেও আগের মতই মেরে হাড় গুঁড়ো করব। তবে আজকের কথা আলাদা। বিশেষ এই দিনটিতে অন্তত আপনাদের প্রতি রাগ, বিদ্বেষ ও ঘৃণা ভুলে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি আমি। আসুন, আপনারা সবাই মাটির পাহাড়ে চড়ুন। ওটাই আপনাদের জন্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা। আপনাদের মধ্যেও যদি কেউ ভয় পেয়ে থাকেন, সময় থাকতে চলে যেতে পারেন।'

কোন সাংবাদিকই ভয় পেল বলে মনে হলো না। একে একে সবাই গিয়ে পাহাড়ে চড়ল। পত্রিকা অফিসের পিয়ন-দারোয়ানরাও পিছিয়ে রইল না। অপ্রত্যাশিতভাবে বসার ভাল জায়গা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। দু'একজন রিপোর্টার প্রফেসরের উদ্দেশ্যে হাততালিও দিয়ে ফেলল।

মুচকি হাসলেন প্রফেসর। তারপর আবার শুরু করলেন, 'সামান্য একপাল মানুষকে খোঁটা দেয়ার কোন অভিপ্রায় আমার নেই। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কি আমি করতে যাচ্ছি, সেটা ব্যাখ্যা করতে চাই না। করে কিছু বোঝাতে পারব না। কাউকে অসম্মান করার জন্যে বলছি না, আসলে আপনাদের মোটা মাথায় আমার পরীক্ষার তাৎপর্য তেমন বোধগম্য হবে না।

'অভদ্রভাবে কথার মাঝে বাগড়া দেয়ার চেষ্টা করছেন কয়েকজন, দেখতে পাচ্ছি। মোষের শিংয়ের চশমাওয়ালা সাহেবকে অনুরোধ করছি, অহেতুক মাথার

ওপর ছাতা নাড়বেন না। অন্যের দেখতে অসুবিধে হচ্ছে। এত শোরগোল করছেন কেন? ও, 'একপাল মানুষ' শব্দটা পছন্দ হয়নি? বেশ, পরিবর্তন করে বলছি। আমার এক্সপেরিমেন্ট দেখতে এসেছেন একপাল অসামান্য মানুষ। শব্দচয়ন নিয়ে মাথা গরম করে বোকারা। হ্যাঁ, যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম—মোষ ভদ্রলোক বাধা না দিলে, আই মীন, মোষের শিংওয়ালা ভদ্রলোক—আজকের এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে অনেক চিন্তাভাবনা করে একটা বই লিখছি আমি। আমার জন্যে বইয়ের ভাষা খুব সহজ। তারপরেও ভাবছি, আপনাদের অতিসামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিতে সেটা কতখানি সহজ হবে, কে জানে। বইটা এখনও প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু আমি জানি প্রকাশিত হলেই দুনিয়ার বড় বড় বিজ্ঞানীদের মাঝে সাড়া পড়ে যাবে। বড় বলছি বটে, কিন্তু তাই বলে ভাববেন না ওরা আমার চেয়ে বড়। পৃথিবী সম্পর্কে, পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে এ ধরনের যুগান্তকারী বই আর লেখা হয়নি। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়ে থাকবে এটা।'

দারুণ শোরগোল উঠল দর্শকদের মাঝে। টিটকারি আর ধারাল কথার শোর পড়ে গেল। নানাজনের নানা কথা:

'আসল কথা বলে ফেলো, বোকা ভালুক!'

'ইয়ার্কি মারার জন্যে ডেকেছেন নাকি, সাহেব?'

'ফালতু কথা বলে আজ পার পেতে দেব না তোমাকে, মিয়া!'

'অনেক পয়সা খরচ করে এসেছি! কিছু একটা দেখাতেই হবে!'

ভেবেছিলাম এসব শুনে খেপে যাবেন প্রফেসর। কিন্তু শান্ত রইলেন। 'বুঝিয়ে বলার আগেই যদি বার বার এ রকম বাধা আসে, তো হট্টগোল থামানোর জন্যে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে আমাকে। ব্যবস্থাটা মোটেও উপভোগ্য হবে না বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ভূ-স্তরে ছিদ্র করে একটা কূয়া বানিয়েছি আমি। পৃথিবীর দেহের নরম জায়গায় খোঁচা মেরে ফলাফলটা দেখতে চাই। ড্রিল বসানোর ভার দিয়েছি একজন উপযুক্ত ব্যক্তির ওপর। তার নাম পিয়ারলেস জোনস। কূপ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজেকে জাহির করে। সংবেদনশীল পৃথিবীর খোলসের ঠিক নিচে পিন ফোটানো হবে। এরপর কি ঘটবে, আমিও ঠিক জানি না।'

প্রফেসরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি আমি আর ম্যালোন। আমাদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলেন, 'যান তো, গিয়ে শেষবারের মত দেখে আসুন সব ঠিক আছে কিনা।'

চ্যালেঞ্জারের বেয়াড়া বক্তৃতায় এমন শ্রোতা নেই যার গা জ্বলছে না। আমরা ভেতরের লোক, আমার নিজেরই মনে হচ্ছে, ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে স্নায়ুতে হুল ফোটানো হয়েছে। বাইরে থেকে যারা এসেছে, তাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারলাম। অসন্তোষ আর ঘোর আপত্তির গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল কম্পাউন্ড। শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, গণপিটুনি না শুরু হয়ে যায় প্রফেসরের ওপর। কিন্তু ততটা এগোল না শ্রোতারা। প্রচণ্ড কৌতূহলে ফুটছে। কি করতে চান প্রফেসর, দেখতে চাইছে। সহ্য করছে সে-কারণেই।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন চ্যালেঞ্জার। সামনে ট্রাইপডে বসানো কন্ট্রোল

প্যানেল। প্যানেলের একটা বিশেষ সুইচ টিপলেই চালু হয়ে যাবে জেনারেটর। বিদ্যুৎ গিয়ে চালু করবে মোটর, তীব্র গতিতে নেমে যাবে ড্রিলের ফলা।

লিফটে করে বিশ মিনিটে সুড়ঙ্গের তলায় মোটরের কাছে পৌঁছে গেলাম আমি আর ম্যালোন। যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখলাম। সব ঠিকই আছে। নিচে তেরপলের তলায় কি ঘটছে দেখার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কৌতূহল দমন করতে পারলাম না দু'জনের কেউ। দুরুদুরু বুকে নেমে গেলাম লিফটে করে। তেরপলের কোণা ধরে টান দিলাম। স্তব্ধ হয়ে গেলাম দেখে।

এই বিচিত্র বিস্ময় বলে বোঝানো কঠিন। রহস্যময় কসমিক টেলিপ্যাথি মারফত যেন আগেভাগে খবর পেয়ে গেছে বৃদ্ধ গ্রহটা, আর দেরি নেই, এখুনি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এক আজব পরীক্ষা যাতে তার বিশেষ যন্ত্রণা পাবার সম্ভাবনা আছে। মানুষ-কীটগুলোকে আর বেশি আস্কারা দেয়া যায় না। তাদেরকে যৎসামান্য শিক্ষা দেবার জন্যে যেন ফুঁসে উঠেছে পৃথিবী। প্রচণ্ড রাগে টগবগ করে ফুটছে তার স্নায়ুমণ্ডল। বড় বড় ধূসর বুদ্বুদ চড়চড় শব্দে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে। ওপরে পৌঁছে ফেটে যাচ্ছে বিশ্রী শব্দে। উপরিভাগের কয়েক ইঞ্চি নিচে ছোটবড় কোষের মত বস্তুগুলো দারুণ উত্তেজনায় অস্থির। ঘনঘন পরস্পরের গায়ে লেগে গিয়ে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। স্পন্দনের ঢেউ আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত এবং জোরাল। কোষগুলোর মাঝে প্রবাহিত হচ্ছে ঘন কালচে-লাল এক ধরনের তরল পদার্থ। বদ্ধ ভাপসা বাতাসে তীব্র কটু গন্ধ।

কানের কাছে ফিসফিস করে বলল ম্যালোন, 'ও, মাই গড! জোনস, চলো, এক্ষুণি পালাই! যে কোন মুহূর্তে ফেটে পড়বে পৃথিবী। কোন্ কাণ্ড বাধাচ্ছে প্রফেসর, ঈশ্বরই জানে!'

বিশ ফুট ওপরের চাতালে উঠে এলাম। দেয়ালের গায়ে ভয়াবহ দৃশ্য। নিচের ধূসর প্রহেলিকার মতই স্পন্দিত হচ্ছে এখন নরম দেয়াল। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত যেন। দেয়ালের ভয়ানক কাঁপুনির ফলে প্রায় খুলে এসেছে বরগা দুটো। ধসে পড়বে যে কোন সময়। সুইচ টেপার আর দরকার হবে না। এমনিতেই ঢুকে যাবে ড্রিলের ফলা পৃথিবীর নরম সংবেদনশীল অংশে।

ম্যালোনকে বললাম, 'কেয়ামত হয়ে যাবে আজই, ম্যালোন। প্রফেসরের পাগলামি সমস্ত প্রাণিজগতের বিষম বিপদ ডেকে আনবে। তারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেব আমি। যা হয়, হোক। আপনা-আপনি বরগা ধসে পড়লে আমার করার কিছু নেই। কিন্তু গোটা দুনিয়াটাকে বিপদে ফেলতে পারব না আমি। ওফ্, কি ভয়ঙ্কর!'

দ্রুতহাতে মোটর থেকে জেনারেটরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। তারপর লাফ দিয়ে লিফটে উঠলাম দুজনে। সঙ্গে সঙ্গে লিফটের সুইচ টিপে দিল ম্যালোন। তীরবেগে উঠতে লাগল লিফট। কিন্তু কূয়ার মুখে পৌঁছানো পর্যন্ত টিকবে কিনা বর্গাটা নিশ্চিত হতে পারলাম না।

সুড়ঙ্গের মুখে চাতালে এসে দাঁড়াল লিফট। এক লাফে নেমে এলাম। কয়েক গজ পেরোতে না পেরোতেই ঘটল অঘটন। একসঙ্গে কয়েক কোটি কামান গর্জে উঠল যেন কূয়ার তলায়। থরথর করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি। টাল

সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম ঘাসের ওপর।

ভয়ঙ্কর সাইক্লোন দুরন্ত বেগে বয়ে যাবার আগে যেমন হয় তেমনি, কিন্তু তারচেয়েও হাজারগুণ বেশি জোরাল শব্দ ভেসে এল আবার কুয়ার তলদেশ থেকে। নিথর গ্রীষ্মের আকাশ চিরে ওই শব্দের রেশ ধেয়ে গেল দক্ষিণ উপকূলের দিকে। চ্যানেল পেরিয়ে চলে গেল হয়তো ফরাসী ভূমিতেও। বুঝলাম, এটা আহত ধরিত্রীর আর্তনাদ।

কূয়ার মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। প্রথমে কামানের গোলার মত ছিটকে বেরিয়ে এল একে একে চোদ্দটা লিফট। তারপর ছেঁড়াখোঁড়া তার আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি। তীরের ফলার মত আকাশের দিকে ছুটে গেল লম্বা ড্রিলের ফলাটা। ফিরে এসে কোথায় কার গায়ে পড়বে, কয়জনকে একসঙ্গে গাঁথবে, কে জানে! আলকাতরার মত ঘন চটচটে লালচে-কালো উষ্ণ প্রস্রবণ বেরোল এরপর। ফোয়ারার মত আকাশের প্রায় দুহাজার ফুট ওপরে উঠে গেল। তীব্র দুর্গন্ধে ভরে গেল হেংগিস্ট ডাউনের বাতাস।

উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সেই তরল পদার্থ সোজা এসে পড়তে লাগল অশ্ব-খুর পাহাড়ে। দুর্গন্ধময় তরল পদার্থে পত্রিকা অফিসের প্রতিটি লোক যেন গোসল করে উঠল। এতক্ষণে বুঝলাম কেন ওদেরকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওখানে বসিয়েছিলেন প্রফেসর। নিদারুণ এক রসিকতা করেছেন পত্রিকাওয়ালাদের সঙ্গে। রয় পার্কিন্স আর তার সম্পাদকের অপমানের শোধ নিয়েছেন। তিনি জানতেন পৃথিবীর দুর্বল জায়গায় খোঁচা লাগলে ওই দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ বেরোবে। ফোয়ারার মত উঠে গিয়ে ঝরে পড়বে অশ্ব-খুর পাহাড় আর তার চারপাশের এলাকায়। তাঁর অনুমান সঠিক হয়েছে। পরে শুনেছি জঘন্য সেই তরল পদার্থের গন্ধ নাকি জামাকাপড় তো বটেই, গা থেকে তাড়াতেও কয়েক মাস লেগেছিল সাংবাদিকদের। রাস্তায় বেরোতে পারেনি। ফ্লীট স্ট্রীটের খবরের কাগজের অফিসগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, পৃথিবীর আক্ষেপ থামল এক সময়। উত্তেজনায় সময়ের হিসেব রাখতে পারিনি, তাই বলতে পারব না ঠিক কতক্ষণ তড়পেছে গ্রহটা।

চারদিক আবার নিথর হয়ে আসতে উঠে দাঁড়ালাম। যার যার জায়গায় স্থাণুর মত স্থির বসে আছে জনতা। টুঁ শব্দ নেই। মঞ্চে ঠায় দাঁড়িয়ে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। কূয়ার দিকে তাকিয়ে হাসছেন মিটিমিটি।

সব গণ্ডগোল থেমে যাবার পর প্রায় একসঙ্গে হুল্লোড় করে উঠল জনতা। চ্যালেঞ্জারের জয়জয়কারে ফেটে পড়ল হেংগিস্ট ডাউনের কম্পাউন্ড। কিন্তু একজন সাংবাদিকও কথা বলল না। ক্যামেরা ব্যবহার করল না কেউ. একটা ছবি তুলল না প্রফেসরের। চ্যালেঞ্জারের প্রতি তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে ওদের।

লন্ডনের কোনও পত্রিকায় এই অকল্পনীয় আজব খবরটা বেরোল না।

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের পত্রিকায় কিছু কিছু খবর বেরোল, তবে তাতে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের গবেষণার কথা কেউ লেখেনি। ওরা লিখেছে:

পৃথিবীর সবক'টা আগ্নেয়গিরি, এমনকি মৃত আগ্নেয়গিরিগুলো পর্যন্ত

কয়েক মিনিট অগ্নিবর্ষণ করেছে লন্ডন সময় সকাল সাড়ে এগারোটার পর থেকে। ভিসুভিয়সের চূড়া উড়ে গেছে। লাভার স্রোত বেরিয়েছে এটনার মুখ দিয়ে। ইটালির বেশির ভাগ আঙুরের খেত ধ্বংস হয়ে গেছে লাভার কারণে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঁচ লক্ষ লিরা খেসারত দাবি করেছে এ জন্যে ইটালির সরকার। (ব্রিটিশ সরকার দোষটা চাপিয়ে দিয়েছে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের ঘাড়ে, খেসারতটা দিতে হবে চ্যালেঞ্জারকে) পুরো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল মুখর হয়ে গিয়েছিল স্ট্রম্বলির আর্তনাদে। পৃথিবীর সব জায়গাতেই প্রচণ্ড ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। অনেক বাড়িঘরের ক্ষতি হয়েছে। (এ সব ক্ষতিপূরণও দিতে হবে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে) ব্রিটিশ সরকারকে হুমকি দিয়েছে ক্ষতি হওয়া দেশগুলোর সরকার—এক মাসের মধ্যে সমস্ত ক্ষতিপূরণ আদায় না করলে একজোট হয়ে বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে তারা।

ক্ষতিপূরণের সব টাকা দিতে রাজি হয়েছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। টাকার অভাব হবে না। হেংগিস্ট ডাউনের বিশাল কয়লাখনির মালিক এখন তিনি।

যেদিন পৃথিবীকে খোঁচা মেরেছেন প্রফেসর, সেরাতে তাঁর বাড়িতে বিল নিয়ে গেলাম। নির্দ্বিধায় চেক কেটে দিলেন তিনি। চেকটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'মিস্টার জোনস, রয়'পার্কিন্সের মুখটা দেখেছিলেন তখন? আমি দেখেছি। আহা, যা চেহারা হয়েছিল না! দেখার মত! সবার আগে ভাল ছবি তোলার জন্যে গর্তের একেবারে কিনারে গিয়ে বসেছিল বোকা ছাগলটা। হাহ্ হাহ্ হাহ্ হাহ্!'

ঘরকাঁপানো প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

* * *

অনুবাদ

বিষবলয়

মূলঃ স্যার আর্থার কোনান ডয়েল
রূপান্তরঃ রকিব হাসান

‘হারানো পৃথিবী’র সেই বিশ্ব-বিখ্যাত প্রফেসর চ্যালেঞ্জার
আবার হাজির হয়েছেন তিনটি বৈজ্ঞানিক
কল্প-কাহিনিতে.....

কি করে যেন আগে ভাগেই টের পেয়েছেন পাগলা প্রফেসর,
মহাকাশের একটি বিষ-বলয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে গোটা
পৃথিবী, যার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে।

মহা ধড়িবাজ এক বিজ্ঞানী নাকি আবিষ্কার করেছেন
ডিসইন্টিগ্রেশন মেশিন-
পরীক্ষা করতে চললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

জেনেশুনে, ইচ্ছে করেই পৃথিবীর গভীরে, অন্তরের অন্তস্তলে
বিষম এক খোঁচা লাগিয়ে দিলেন পাগলা প্রফেসর-
নাজেহাল হয়ে গেল সাংবাদিকের দল

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০